বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শের দিকেই ফিরে যেতে হবে

মানবতার বন্ধু, সৃষ্টিকূলের করুণার প্রতিমূর্তি মুহাম্মদ (সা:) যে সময়ে আবির্ভূত হন, সে সময়কে ঐতিহাসিকগণ আইয়্যামে জাহিলিয়্যাত তথা মূর্খতার যুগ, বর্বরতার যুগ, অন্ধকার যুগ প্রভৃতি অভিধায় অভিহিত করেছেন। সে সময়ে মানবতা ছিল চরম বিপর্যস্ত, নৈতিকতা ছিল বিধ্বস্ত, শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল সম্পূর্ণ বিনষ্ট। জান-মালের কোন নিরাপত্তা ছিল না, ছিল না কোন স্থিতি, স্বস্তি বা সুখ। বিদগ্ধ পৃথিবী ছিল অশান্তির এক অগ্নিকুন্ড। মারামারি, হানাহানি, রক্তপাত, খুন-খারাবী, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি ছিল নিত্য দিনের স্বাভাবিক চিত্র। জুলুম-নিপীড়ন-নির্যাতনে পৃথবী ছিল একেবারেই অতিষ্ঠ। মহামানবদের প্রচারিত জ্ঞান এবং স্রষ্টার বাণীর যাবতীয় শিক্ষা মানুষের মন-মস্তিষ্ক হতে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অজ্ঞানতার অন্ধকার, অধর্ম ও অনাচার, নানা পাপাচার ও গ্লানি মানব জাতির জ্ঞান ও বিবেকের এবং সুনীতি ও সদাচারের উপর পুরোপুরি আধিপত্য কায়েম করে বসেছিল।

এমনি এক পঙ্কিল ও পূতিগন্ধময় পরিবেশে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) জন্ম গ্রহণ করেন (৫৭০খৃ. ১২ রবিউল আওয়াল) এবং লালিত-পালিত ও বড় হন। এমন পরিবেশে জন্মগ্রহণ করলেও এর পঙ্কিলতার কোন ছোঁয়াই তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। এ প্রতিকূল পরিবেশেও তিনি উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং মানবিক গুণাবলী ও মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেন। ফলে সে সমাজের সকলেই তাকে আল্আমীন ও আস্সাদিক উপাধিতে ভূষিত করেন। তার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দেন, হে নাবী তুমি এক মহান চরিত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। (সূরা আল্ কলম : ৪)

যুব বয়স থেকেই তিনি সমাজ নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। সে সমাজে বিদ্যমান অন্যায়, জুলুম, অত্যাচার ও অনাচার প্রতিরোধ করে ন্যায়, ইনসাফ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে তিনি হিলফুল ফুজুল নামে একটি শান্তিসংঘ গঠন করেছিলেন। এটি ছিল তার সমাজ পরিবর্তনের প্রথম উদ্যোগ। নবুওয়াত লাভের পর তিনি একটি আদর্শ সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এ লক্ষ্যে তিনি নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

তিনি অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সকলের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেন। তাঁর অনুপ্রেরণা, বাধ্যবাধকতা ও বাস্তব পদক্ষেপের কারণে ইসলাম গ্রহণকারী জনগোষ্ঠী সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য হিসেবে গড়ে উঠে। এ সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীই অজ্ঞতার অন্ধকার বিদূরিত করে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে বিশ্ব সমাজকে আলোকিত করেছিলে।

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলার কারণ হলো অন্যায়-অনাচার, জুলুম, নিপীড়ন, দুর্নীতি ও দুষ্কর্ম। এগুলোর মূল কারণ হলো নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়।

তদানিন্তন সমাজে এবং বর্তমান সমাজেও মানবিক বিপর্যয়, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং অন্যায় জুলুমের মূল কারণ এটি। এজন্য মুহাম্মদ (সা:) মানুষের নৈতিক চরিত্র সংশোধন ও গঠনের দিকে মননিবেশ করেন। তিনি তদানিন্তন অসভ্য আরবের অসৎ চরিত্রের মানুষগুলোকে পরিশুদ্ধ করে পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী করেছিলেন। তিনি নৈতিক চরিত্রে চরম অধ:পতিত এক অসভ্য জাতিকে পূতিগন্ধময় গহবর থেকে টেনে তুলে সভ্যতার শীর্ষ চূড়ায় পৌছিয়ে দিয়েছিলেন, যারা বিশ্বকে এক নতুন সভ্যতা ও শান্তিময় সমাজ উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন সুশিক্ষিত একদল লোক তৈরী করে মুহাম্মদ (সা:) সফল এক সামাজিক বিপ্লব সংগঠনে সমর্থ হয়েছিলেন। কলহপ্রিয়, শতধা বিভক্ত আরববাসীকে তিনি এক সূত্রে গ্রথিত করে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং গোত্র শাসনের অবসান ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় শাসন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। এ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তিনি নাগরিকদের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইনসাফপূর্ণ শাসন ও ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করেছিলেন। তাঁর শাসন ব্যবস্থায় তিনি মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ সুনিশ্চিত করেছিলেন।

পাশাপশি তিনি নারীদের অধিকার ও মান সম্মান সুরক্ষায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই নিগৃহীত ও অধিকার বঞ্চিত নারী সমাজ তাদের সম্মান ও আর্থ-সামাজিক অধিকার ফিরে পেয়েছিলেন। তিনি তার শাসন ব্যবস্থায় সকল ধর্মের নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা সুরক্ষিত করেছিলেন এবং অমুসলিম নাগরিকদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন।

মানবতার কল্যাণে তিনি যে অনুপম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তার ফলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, যা বিশ্ব মানবতাকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল।

মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিলেন উত্তম আদর্শ। আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, "নি:সন্দেহে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (৩৩, সূরা আল্ আহযাব : ২১)

শান্তিপূর্ণ ও আদর্শ সমাজ-রাষ্ট্র গঠনে মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর নির্দেশিকার আলোকে যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করে গিয়েছেন, আদর্শ সমাজ ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব বিনির্মাণে সে ব্যবস্থাই হতে পারে একমাত্র বিকল্প। এ থেকে বিচ্যুতি গোটা বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিকেই বিঘ্নিত করবে। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে মুহাম্মদ (সা.) সে কথাটিই বলেছেন এভাবে, "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা এ দু'টিকে মজবুতভাবে ধারণ করবে, ততদিন পথভ্রান্ত হবে না। তার একটি হলো আল্লাহর কিতাব (আল কুরআন) আর অন্যটি হলো তাঁর নাবীর সুন্নাহ (আল হাদীছ)।"

আজকের বিশ্বও ক্রমান্বয়ে অশান্ত হয়ে উঠছে। দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যুদ্ধ, জান-মালের নিরাপত্তাহীনতা মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে। উদ্ধত স্বৈরশাকদের জুলুমে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে মানবতা আর্তনাদ করছে। নানা অন্যায় অজুহাতে মানুষকে হত্যা করা, নিজ আবাসভূমি থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করা এক শ্রেণির জালিম শাসকের বাতিকে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় অনেক বিশেষজ্ঞ বিশ্বযুদ্ধের অশনি সংকেতও দেখতে পাচ্ছেন। মোট কথা বিশ্বে

এখন এমন অবস্থা বিরাজ করছে যে, মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এর মূল কারণ, মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ থেকে বিচ্যুতি। সুতরাং এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে এবং আদর্শ বিশ্বসমাজ ও শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে মুহাম্মদ (সা.) রেখে যাওয়া আদর্শের দিকেই মানব জাতিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। যেমনটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী জর্জ বার্নাডশ বলেছেন,

I believe that if a man like prophet Muhammad was to assume the dictatorship of modern world, would success in solving it's problem in a way that would being in men needed peace and happiness.

"আমার বিশ্বাস নবী মুহাম্মদের মত কোন ব্যক্তি যদি বর্তমান বিশ্বের একনায়কের পদে আসীন হতেন, তাহলে তিনিই বর্তমান বিশ্বের সমস্যাবলীর সমাধান দিতে পারতেন, যার ফলে সমস্ত বিশ্বে মানুষের কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও সুখ নেমে আসত।" ■

দারসুল কোরআন

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

{وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ}

অনুবাদ: 'আর কবিগণ, পথভ্রষ্টরাই তো তাদের অনুসরণ করে। আপনি দেখেন না যে, তারা (কবিগণ) সকল উপত্যাকাতেই উদ্ভ্রান্তের মত বিচরণ করে? আর তারা তো এমন কথা বলে যা তারা করে না। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করেছে। আর তারা নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। আর যারা যুলম করে তারা অচিরেই জেনে যাবে যে, তারা কোন ধরনের গন্তব্যস্থলে প্রত্যাবর্তন করবে', [আশ্‌শু'আরা– ২৬: ২২৪- ২২৭]।

নামকরণ, আলোচ্য আয়াতগুলোর ২২৪ নং আয়াতে উল্লেখিত الشُّعَرَاءُ শব্দটি দ্বারাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে, الشَّاعِرِঅর্থ কবি। বহুবচনে এর অর্থ কবিগণ।

নাযিলের সময় ও কাল,অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এ সূরাটি মাক্কী সূরা। তবে ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো অর্থাৎ সূরাটির শেষ ৪টি আয়াত মাদানী, [তাফসীরুল বাগাভী ৩/৪৬১, তাফসীরুল কুরতুবী ১৩/৮৭, ফাতহুল কাদীর ৪/১০৮,]। নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বলেন যে, কুরাইশের কাফির কবিগণ 'হিজা' (নিন্দা ও তিরস্কার মূলক) কবিতা রচনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আক্রমণ করতো। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 'আব্দুল্লাহ ইবনুয যিবা'রা আস্‌–সাহমী, হুবাইরাহ ইবন আবি ওয়াহ্‌ব আল– মাখযূমী, মুশাফি' ইবন 'আব্দ মুনাফ, আবু 'আয্‌যাহ ইবন 'আবি আব্দিল্লাহ আল– জুমাহী, উমাইয়া ইবন আবিস সালত আস্‌– সাকাফী প্রমূখ। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে মিথ্যা, বিভ্রান্ত ও বাতিল কথাবার্তা বলে বেড়াত আর বলত, মুহাম্মাদ কবিতার মত করে যা বলে আমরাও তাই বলি এবং তারা কবিতা বলত। তখন কিছু বখাটে ও বিভ্রান্ত লোকেরা তাদের কাছে এসে একত্রিত হয়ে তাদের কবিতা শুনতো এবং মানুষের কাছে প্রচার করতো, [তাফসীরুল বাগাভী ৩/৪৮৪- ৪৮৫]।

সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয়, কাফিরগণ কর্তৃক ইসলামের দা'ওয়াত গ্রহণ না করায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অস্থিরতা। সত্য দীনের দা'ওয়াত গ্রহণ না করার পেছনে কাফিরদের হঠকারিতা এবং সত্যকে মেনে না নেয়ার স্বভাবগত অভ্যাস। সত্য দীন গ্রহণে সহায়ক হিসেবে হাজারো নিদর্শন চতুর্দিকে বিদ্যমান। ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির নিদর্শন বিদ্যমান। মহাসত্য আল- কুরআন দীপ্তমান, যা মহান রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকে তাঁর শেষ রাসূলের প্রতি 'আরবী ভাষাতেই নাযিল হয়েছে, যে ভাষাটি কুরইশদের। এটা কোন শাইতান, জিন ও গণকের কথা নয়।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর ও ব্যাখ্যা, মহান আল্লাহ বলেন,وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ **'আরকবিগণ, পথভ্রষ্টরাই তো তাদের অনুসরণ করে'**,। আয়াতে উল্লেখিত الشُّعَرَاءُ শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে, الشَّاعِر যেমন جَاهِل একবচন, এর বহুবচন جُهَلاَء। এ আয়াতটিতে কবিদের প্রসঙ্গ আলোচনা হয়েছে। আমরা জানি যে,সাহিত্য- সংস্কৃতি মানব জীবনের স্বভাবসম্মত অপরিহার্য অনুষঙ্গ। কবিতা ও কাব্য সাহিত্যের অংশ। ইসলাম মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কেই ধারন করে। তাই স্বাভাবিকভাবে কবিতা, কবি, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশনা রয়েছে। আল- কুরআন নাযিলের সময় আরব সমাজে কবিতার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কবিতাকে 'আরব সমাজের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুখপাত্র হিসেবে বিবেচনাকরা হয়। কবিতাকে আরব সমাজের দর্পন বলা হয়। কবিতার মাধ্যমে সমাজের সার্বিক চিত্র ফুটে উঠে। তাই স্বাভাবিকভাবেই الشِّعْرকবিতা,الشَّاعِرকবি বাالشُّعَرَاءকবিগণ এ বিষয়গুলো নিয়ে আল- কুরআনে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে গুরুত্বের সাথে আলোচনা হয়েছে। এর মাধ্যমে কবি ও কবিতা সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। এ আয়াত স্পষ্টভাবেই এটা প্রমাণ করে যে, যারা কবিগণের অনুসরণ করে তারা প্রকৃতপক্ষে মানুষ ও জিন শাইতান প্রকৃতির লোক। তারা ভ্রষ্ট ও বিপথগামী। এ ধরনের বিভ্রান্ত , বখাটে ও উদ্ভ্রান্ত মানুষ ছাড়া শাইতানের প্রকৃত প্রভাব কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই শাইতানের অনুসারী শাইতানী স্বভাব- চরিত্রের লোকেরাই। ভাল ও চরিত্রবান লোকেরা শাইতানের অনুসরণ করে না। আল্লাহ তা'আলা অন্য একটি আয়াতে শাইতানকে সম্বোধন করে বলেন,

{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ}

'বিভ্রান্তদের মধ্যে যে তোমার অনুসরণ করবে সে ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা থাকবে না', [আল- হিজর- ১৫: ৪২]। অর্থাৎ স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। সাময়িক প্রভাব ফেলতে পারলেও পরক্ষণেই তারা নিজেদের ভুল বুঝে খাঁটি তাওবাহ করে নেয়, যেমন আদম ও হাওয়া (আ) এর ক্ষেত্রে হয়েছে, [তাফসীরুল কুরতুবী ১০/২৯, ফাতহুল কাদীর ৩/১৫৮]। এ আয়াত থেকে আর প্রমাণিত হয় যে, কাফিরগণ যে দাবী করত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবি ছিলেন, তাদের সে দাবী একেবারেই ডাহা মিথ্যা ও নিছক কল্পকাহিনী। কেননা কবিদেরকে তো বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, দুষ্ট প্রকৃতি, চরিত্রহীন ও বখাটে লোকেরাই অনুসরণ করে। এই স্বভাব- প্রকৃতির লোকেরাই তাদের সাথে চলা-ফেরা ও উঠা-বসা করে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম ও যারা তার সাথে চলা–ফেরা করে, তার অনুসরণ করে কথাবার্তায়, চলাফেরায়, স্বভাবে– চরিত্রে, নৈতিকতায়, অভ্যাসে, আচার- আচরণে সম্পূর্ণ আলাদা। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবি হওয়া এবং কবিদের অনুসরণ হওয়া আদৌ সম্ভব নয়, [আশ্– শানকীতী, আদওয়াউল বায়ান ৬/১০৪]। কাফির ও মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কবি বলে অপবাদ দেয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ}

'বরং তারা বলে, এটা অলীক কল্পনা, বরং সে এটাকে মিথ্যা রচনা করেছে, বরং সে একজন কবি। সুতরাং সে আমাদের কাছে এক নিদর্শন নিয়ে আসুক, যেমন পূর্ববর্তীগণ নিদর্শনসহ প্রেরীত হয়েছিল', [আল–আম্বিয়া– ২১: ৫] ।আল্লাহ তা'আলা আর বলেন,

{أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ}

'নাকি তারা বলে, সে একজন কবি? আমরা তার মৃত্যুর প্রতিক্ষা করছি', [আত্– তূর– ৫২: ৩১– ৩২]।

আল্লাহ তা'আলা আর বলেন,

{وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ}

'আর তারা বলে, আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের ইলাহগণকে পরিত্যাগ করব', [আস্– সাফ্ফাত– ৩৭: ৩৬]। মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ কাফির মুশরিকদের এ অপবাদের প্রতিবাদ করেছেন ও তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ}

'আর এটা কোন কবির কথা নয়, তোমরা খুব অল্পই ঈমান পোষণ কর', [আল– হাক্কাহ– ৬৯: ৪১]। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবি হবেন কি ভাবে।স্বয়ং রাব্বুল 'আলামীন আল– কুরআন নাযিলকারী মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ তাকে তো কবিতা শিক্ষা দেননি বরং তিনি তার কাছে মানুষের পথপ্রদর্শক ও জীবন বিধান হিসেবে আল– কুরআন নাযিল করেছেন, মুক্তি, শান্তি ও সার্বিক কল্যাণের বাণী শিখিয়েছেন। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ

'আর আমরা তাকে কবিতা শিখাইনি এবং এটা তার জন্য শোভনীয়ও নয়। এটা তো শুধু এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন', [ইয়াসীন- ৩৬:৬৯]। করুণাময় আল্লাহ বলেন,

{وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ}

'আর তারা বলে, আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের ইলাহগণকে পরিত্যাগ করব, বরং তিনি তো সত্য নিয়ে এসেছেন এবং তিনি রাসূলগণকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন', [আস্– সাফ্ফাত– ৩৭: ৩৬- ৩৭]। 'রাসূল সত্য নিয়ে এসেছেন' এ কথার মাধ্যমে রাসূলকে কবি বলে তাদের অপবাদ দেয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, [আদওয়াউল বায়ান ৬/১০৪- ১০৭]। কবিতা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও খুবই ঘৃণ্য ও কঠিন কথা বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا

‘কোন ব্যক্তির পেট পুঁজে ভরে থাকা যা তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে, কবিতায় ভরা থাকার চেয়ে শ্রেয়ঃ’, [সাহীহুল বুখারী ৮/৩৭, নং ৬১৫৫]। আবু সা‘ঈ আল– খুদরী (রা) থেকে আর বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ‘আরয’ নামক স্থানে পথ চলছিলাম। এমতাবস্থায় একজন ব্যক্তি কবিতা পড়তে পড়তে উপস্থিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

خُذُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا

‘তোমরা শাইতানটিকে ধর অথবা শাইতানটিকে পাকড়াও কর; বস্তুতঃ কোন ব্যক্তির পেট পুঁজে ভরে থাকা যা তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে, কবিতায় ভরা থাকার চেয়ে শ্রেয়ঃ’, [সাহীহ মুসলিম ৪/১৭৬৯, নং ২২৫৯]।

আলোচ্য আয়াতে কবিদেরকে কেন নিন্দিতভাবে উপাস্থাপন করা হয়েছে তার একটি কারণ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী হচ্ছে, أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ **আপনি দেখেন না যে, তারা (কবিগণ) সকল উপত্যাকাতেই উদ্ভ্রান্তের মত বিচরণ করে?** অর্থাৎ তারা অনর্থক কর্ম–কান্ডে ডুবে থাকে। সত্যের পথ নিয়ে তারা মোটেই ভাবে না। আসলে এ ধরনের কবিদের নিজেস্ব চিন্তা ও শব্দমালা ব্যবহার করার কোন নির্দিষ্ট রীতি- নীতি নেই। তাদের চিন্তার পাগলা ঘোড়া লাগামহীন ভাবে মাঠে প্রান্তরে ও উপত্যাকায় উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে বেড়ায়। অলিক কথাবার্তা, মিথ্যা প্রশংসা এবং বাতিল ধ্যাণ– ধারনা প্রচার করাই তার উদ্দেশ্য। সমাজ সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি– কালচার সব ধ্বংস করে বস্তুবাদিতা, নাস্তিক্যবাদ, অনৈতিক রীতি–নীতির প্রসার ঘটানো ইত্যাদি কর্মই তাদের একমাত্র অবলম্বন, [তাফসীরুল কুরতুবী ১৩/১৫২, ।

এ ধরনের কবিদের আরেকটি বৈশিষ্ট সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ **‘আর তারা তো এমন কথা বলে যা তারা করে না’**। অর্থাৎ তারা কবিতার মধ্যে যা বলে তারা তা বাস্তবে করে না। তারা বলতো এক রকম আর করতো অন্য রকম। তাদের কবিতায় দানশীলতার মাহাত্ম, বীরত্বের কথা, অল্পে তুষ্টি ও আত্ম মর্যাদাবোধ ইত্যাদি বলিষ্টভাবে তুলে ধরে কিন্তু বাস্তবে তারা লোভ, লালসা, কাপুরুষতা, আত্ম বিক্রয় ইত্যাদিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে। আবার কখনো ইতিবাচক অবস্থাতে নারী আসক্তির কথা, নারীর প্রেমে ফাঁদে পড়ার গল্প, মদ্যপায়ী হিসেবে নিজেকে গর্বের সাথে তুলে ধরা অথচ বাস্তবে এ গুলোর সাথে জড়িত নাও থাকতে পারে। এ দিক থেকেও তারা যা বলে বাস্তবে তা করে না। এসবই কবিদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তাই তারা নিন্দিত ও তিরস্কৃত, [তাফসীরুল কুরতুবী ১৩/৫২]।

আল্লাহ তা‘আলার পবিত্র বাণী, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا **‘তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করেছে। আর তারা নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে’,** । আলোচ্য আয়াতগুলোর ২২৪- ২২৬ নং আয়াতে সাধারণভাবে কবিদের ও তাদের অনুসারীদের প্রতি

যে তিরস্কার বা নিন্দার কথা ফুটে উঠেছে এ আয়াতের মাধ্যমে আরেক দল এমন কবিদেরকে তাদের থেকে আলা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে কয়েকটি গুণাগুন বিদ্যমান রয়েছে;

এক. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا **'যারা ঈমান এনেছে'**, অর্থাৎ আল্লাহ, তাঁর রাসূলগণ, কিতাবসমূহ, আখিরাত ও তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে। তারা খাঁটি তাওহীদবাদী ও আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণাকারী। তারা ঈমানের দাবী করার পর ঈমানকে নির্ভেজাল শিরকমুক্ত রেখেছে। তাওহীদী 'আকীদা- বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন বিশ্বাস ও কর্মের সাথে জড়িত হয়নি।

দুই. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ **'আর সৎকর্ম করেছে'।** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের নিরংকুশ আনুগত্য করে। ইসলামের করনীয় ও অনুমোদিত যাবতীয় কর্ম নিষ্ঠার সাথে পালন করে এবং অননুমোদিত ও নিষিদ্ধ সকল বর্জনীয় কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকে। তারা পাপাচার ও দুষ্কৃতিকারী নয়।

তিন. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا **'আর আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করেছে',।** অর্থাৎ তারা তাদের জীবনের সকল অবস্থায়, কাজে- কর্মে, চিন্তা- চেতনায়, লেখা ও রচনায়, বক্তৃতায়, আদান- প্রদান, ব্যবসা- বানিজ্যে, বিচার- শালিসে, শাসন ও প্রশাসনে আল্লাহর কথা ও তাঁর বিধানের কথা স্মরণ করে ও বাস্তবে মান্য করে চলে। তাদের সার্বিক জীবনে আল্লাহভীতি এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য রয়েছে। তাদের লেখালেখিতে ও রচনায় পাপ- পংকিলতা, লালসা ও কামনা রসে পরিপূর্ণ, মানুষের চরিত্র হনন, অশ্লীলতার প্রকাশ ইত্যাদির মত কদর্যতার ছাপ থাকে এমন যেন না হয়। আবার এমনও যেন না হয় কথায়, লেখায়, বক্তৃতায় এবং বাহ্যিকতায় বড়ই প্রজ্ঞা, গভীর তত্বকথা, উন্নত নৈতিকতা, চারিত্রিক মাধুর্যতা আওড়ানো হয় কিন্তু ব্যক্তি জীবনে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ এবং তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের কোন চিহ্ন নেই। বরং তাদের কথাবার্তায়, লেখালেখি ও কাব্য কবিতায় থাকবে মানুষের সার্বিক কল্যাণের কথা, সামগ্রিক উন্নয়ন, আত্মশুদ্ধি, দীন- ও নির্ভেজাল আকীদা- বিশ্বাস, উন্নত নৈতিকতা, অনুপম চরিত্র গঠনের অনুপ্রেরণ। মানুষের সার্বিক কল্যাণ, ইসলামী আদর্শ বিরোধী যাবতীয় অপতৎপরতার প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষায় সোচ্চার ভূমিকা পালন করবে।

চার.وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا **'আর তারা নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে'**।অর্থাৎ তারা আক্রান্ত হওয়ার পরই কেবল আক্রমণ করে। যুলম ও নির্যাতনের শিকার হওয়ার পরই কেবল তারা যুলমের প্রতিশোধ নেয়। এ সকল কবিগণ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে কাউকে কবিতার মাধ্যমে আক্রমণ করেনা, নিন্দা- তিরস্কার করে না। ব্যক্তিগত, বংশীয় ও জাতীয় বিদ্বেষে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের আগুন জ্বালায় না। তারা যালিমের মোকাবেলায়ই সত্যের আওয়ায তুলে ধরতে ও সত্য দীনের সমর্থন, প্রচার, প্রসার, প্রতিষ্ঠা, প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনেই কেবল তাদের বাকশক্তি, কণ্ঠ ও কবিতার অস্ত্র ব্যবহার করে, [আশ্- শাওকানী, ফাতহুল কাদীর ৪/১৪০]।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ **'আর যারা যুলম করে তারা অচিরেই জেনে যাবে যে, তারা কোন ধরনের গন্তব্যস্থলে প্রত্যাবর্তন করবে'**। অর্থাৎ

যালিমদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। আর যারা মাযলুম তারা পরকালে আল্লাহর দয়া ও সাহায্যের অপেক্ষা করে, [তাফসীরুলক কুরতুবী ১৩/১৫৩]।

ইসলামী দা'ওয়াতী যুগে কাফির ও মুশরিকচক্র যখন ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে নানা প্রকারের অস্ত্র ব্যবহার করতো। সাথে সাথে তাদের কবিদের দ্বারাও নানা অভিযোগ, দোষারোপ ও অপবাদের সয়লাব সৃষ্টি করেছিল। সেসব কবি তাদের কবিতার মাধ্যমে চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষ– বাষ্প ছড়াতো, তার সমুচিত জবাব দেবার জন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবী কবিদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন ও সাহস যোগাতেন। এ সম্পর্কে সাহীহ হাদীসে অনেক বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে। আল–বারা ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইযার দিবসে হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা)কে বলেন,

اهْجُ الْمُشْرِكِينَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ

'তুমি মুশরিকদেরকে নিন্দা জ্ঞাপন করো, নিশ্চয় জিবরীল তোমার সাথে আছেন', [সাহীহুল বুখারী ৫/১১৩, নং ৪১২৪, মুসনাদ আহমাদ ৩০/৬২৩, নং ১৮৬৯০]। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে হাস্‌সানের জন্য মিম্বার বানিয়ে দিতেন, যার উপর দাঁড়িয়ে হাস্‌সান (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, যারা হিজা বা নিন্দা, তিরস্কার ও দোষারোপ করত এর প্রতিবাদে তাদেরকেও নিন্দা ও দোষারোপ করে কবিতা বলতেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন,

إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا يُفَاخِرُ، أَوْ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'নিশ্চয় আল্লাহ হাস্‌সানকে রুহুল কুদুস বা জিবরীলকে দিয়ে সাহায্য করেন, যতক্ষণ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৌরব গাঁথা কিংবা তার প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষায় কবিতা বলতে থাকেন', [সুনানুত তিরমিযী ৪/৪৩৫, নং ২৮৪৬, সুনান আবি দাউদ ৪/৩০৪, নং ৫০১৫, ইমাম আত্– তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সাহীহ এবং আলবানী হাসান বলেছেন]।হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলামী দা'ওয়াতের পক্ষে কাফির মুশরিকদেরকে প্রতিরোধ করেছেন।কবিতার মাধ্যমে তাদের আক্রমণের সমুচিত জবাব দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূলের প্রশংসা ও ইসলামের শ্বাশ্বত বাণী তার ক্ষুরধার শব্দমালা দিয়ে গাঁথা কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি কবিতার জিহাদে সফলভাবে বীরত্বের সাথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাই তো তিনি شَاعِرُ الرَّسُول বা 'রাসূলেন কবি' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন।

হাস্‌সান ইবন সাবিত(রা) ছাড়াও অন্যান্য মুসলিম কবিগণও মুশরিকদেরকে নিন্দা করে ইসলামী দা'ওয়াত ও এর রাসূলের পক্ষে প্রতিবাদ করেছেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহাহও কা'আব ইবন মালিক (রা)। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

اهْجُوا قُرَيْشًا، فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: اهْجُهُمْ فَهَجَاهُمْ فَلَمْ

يُرْضِ، فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الْأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنَبِهِ، ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَفْرِيَنَّهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الْأَدِيمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا، حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي، فَأَتَاهُ حَسَّانُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ لَخَّصَ لِي نَسَبَكَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لِحَسَّانَ: إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ، مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى

'তোমরা কুরাইশদের নিন্দা করে কবিতা বল; কেননা নিন্দাসূচক কবিতা তাদের উপরে তীরের চেয়ে কঠিনভাবে আঘাত করে'। এরপর তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহাহর কাছে প্রেরণ করলেন এবং বললেন, 'তুমি তাদেরকে নিন্দা কর'। তিনি তাদেরকে নিন্দা করে কবিতা বললেন কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। অতঃপর কা'আব ইবন মালিকের কাছে পাঠালেন, তারপর হাস্‌সান ইবন সাবিতের কাছে পাঠালেন। হাস্‌সান (রা) বলেন, আপনাদের এখন সময় হয়েছে যে, আপনারা এই সিংহ, যে তার লেজ দ্বারা পিটায়, তাকে পাঠাচ্ছেন। অতঃপর তিনি তার জিহ্বা বের করে তা নাড়াতে শুরু করেন। তারপর বলেন, ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন! আমি তাদেরকে আমার জিহ্বা দ্বারা চামড়া ছিলার মত ছিলে ফেলব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি তাড়াহুড়ো করো না। কেননা আবু বাকর কুরাইশের বংশনামা সম্পর্কে অধিক অবগত। আর কুরাইশ বংশের সাথে আমার সম্পর্ক আছে। সে তোমাকে তাদের মধ্যে থেকে আমার বংশীয় ধারাকে নির্দিষ্ট করে দিবে। হাস্‌সান (রা) তার কাছে আসলেন এবং ফিরে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি আমাকে আপনার নসবনামা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন, আমি কুরাইশদের থেকে আপনাকে এমনভাবে বের করে আনব যেমন আটা থেকে চুল বের করে আনা হয়। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাস্‌সানের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয় রুহুল কুদুস বা জিবরীল তোমাকে সাহায্য করতে থাকবে যতক্ষণ তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষে প্রতিরোধ করতে থাকবে'। 'আয়িশা (রা) আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, হাস্‌সান তাদেরকে নিন্দাসূচক কবিতা বলে তৃপ্তি দিয়েছে এবং নিজেও পরিতৃপ্ত হয়েছে',[সাহীহ মুসলিম ৪/১৯৩৫, নং ২৪৯০, আল-বাইহাকী, আস্- সুনানুল কুবরা ১০/৪০৩, নং ২১১০৬]।

কা'আব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তো কবিতার ব্যাপারে যা নাযিল করার তা তো করেছেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَكَأَنَّ مَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَضْحُ النَّبْلِ

'মু'মিন ব্যক্তি নিশ্চয় তার তরবারী এবং জিহ্বা দ্বারা জিহাদ করে। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! তোমরা কবিতা দ্বারা যা তাদেরকে নিক্ষেপ কর তা প্রকৃত তীরের ফলকের মতই', [মুসনাদ আহমাদ ৪৫/১৪৮, নং ২৭১৭৪, সাহীহ ইবন হিব্বান ১১/৬, নং ৪৭০৭, আলবানীসহ অনেকেই হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন, আস্–সাহীহাহ, নং ১৬৩১]।

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের জিহ্বা দ্বারা জিহাদ কর', [সুনান আবি দাউদ ৩/১০, নং ২৫০৪, মুসনাদ আহমাদ ১৯/২৭২, নং ১২২৪৬, সাহীহ ইবন হিব্বান ১১/৬, নং ৪৭০৮, আলবানীসহ অনেকেই হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও কোন কোন কবির কবিতা শুনতে পছন্দ করতেন। 'উমার ইবনুশ্ শুরাইদ তার পিতা শুরাইদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেছেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে বাহনে বসা ছিলাম, তখন তিনি বলেন,

هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هِيهْ فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: هِيهْ، ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: هِيهْ، حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ

'তোমার কাছে কি উমাইয়া ইবন আবিস– সাল্তের কবিতার কিছু আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, বল। আমি তার কাছে একটি লাইন পড়লাম। তিনি আবার বলেন, আর বল, তারপর আমি আরেকটি লাইন পড়লাম। তিনি বললেন, আর পড়। এ ভাবে তার কাছে একশটি কবিতার লাইন আবৃত্তি করলাম', [সাহীহ মুসলিম ৪/১৭৬৭, নং ২২৫৫, আল– বুখারী, আল– আদাবুল মুফরাদ ১/২৭৮, নং ৭৯৯]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, কবিতার মধ্যে অনেক জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মূল্যবান কথা রয়েছে। একইভাবে তিনি বক্তৃতা ও বর্ণনা শিল্পেরও প্রশংসা করেছেন। উবাই ইবন কা'আব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً

'নিঃসন্দেহে কতক কবিতার মধ্যে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা রয়েছে', [সাহীহুল বুখারী ৮/৩৪, নং ৬১৪৫, সুনান আবি দাউদ ৪/৩০৩, নং ৫০১০]। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলেন, পূর্বাঞ্চল থেকে দু'জন ব্যক্তি এসে বক্তৃতা শুরু করল। লোকেরা তাদের বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে পড়ল। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

'নিঃসন্দেহে কতক বর্ণনার মধ্যে অবশ্যই যাদু আছে', [সাহীহুল বুখারী ৭/১৩৮, নং৫৭৬৭, সাহীহ মুসলিম ২/৫৯৪, নং ৮৬৯]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের সাথে বসে তাদের কবিতা আবৃত্তি এবং জাহিলী যুগের কিছু বিষয়ের আলোচনা চুপ করে শুনতেন এবং মুচকি হাসতেন, যা

তার ভাল ও আদর্শ কবিতার প্রতি আগ্রহকে প্রমাণ করে। জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَالَسْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ، فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ، وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ، فَرُبَّمَا يَتَبَسَّمُ مَعَهُمْ

'আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শতাধিকবার বসেছি। তার সাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করত এবং জাহিলী যুগের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন আর তিনি চুপ থাকতেন। সম্ভবতঃ তিনি তাদের সাথে মুচকি হাসি দিতেন', [সুনানুত তিরমিযী ৪/৪৩৭, নং ২৮৫০, মুসনাদ আহমাদ ৩৪/৪০৫, নং ২০৮১০, সাহীহ ইবন হিব্বান ১৩/৯৭, নং ৫৭৮১, ইমাম আত্– তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সাহীহ এবং আলবানীসহ অনেকেই সাহীহ বলেছেন]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কবিতার কতক অংশ আওড়াতেন; কেননা এর বিষয়বস্তু চুড়ান্ত পর্যায়ের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দ্বারা ভর্তি। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَا ِلٌ ... وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ

'সবচেয়ে সত্য কথা যা কবি লাবীদ বলেছেন, তা হলো,

আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল ... আর উমাইয়া ইবন আবিস্ সালত তো প্রায় ইসলাম গ্রহণ করেছে', [সাহীহুল বুখারী ৫/৪৩, নং ৩৮৪১, সাহীহ মুসলিম ৪/১৯৬৮, নং ২২৫৬]।

আবু হুরাইরা (রা) জুমু'আর দিন মাসজিদে দাঁড়িয়ে ও'য়াজ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তির উদ্বৃতি দিয়ে বলতেন যে, তিনি বলেন,

إِنَّ أَخًا لَكُمْ لاَ يَقُولُ الرَّفَثَ يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ...إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الفَجْرِ سَا ِعُ

'তোমাদের ভাই অর্থাৎ 'আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা খারাপ কথা বলেনা যে, 'আর আমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল আছেন, যিনি তাঁর কিতাব তিলাওয়া করেন ... যখন ফজরের কল্যাণ উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হয়', [সাহীহুল বুখারী ২/৫৫, নং ১১৫৫]। এভাবে ভাল ও দায়িত্বশীল কবিতা ও কবিদের প্রশংসায় অনেক প্রমাণাদি আছে, যেগুলোতে ইসলাম, ইসলামের প্রচার, প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিরোধ– প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্য, কাব্য ও কবিতার অগ্রনী ভূমিকার কথা সুউচ্চে ধরা হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীগণের (রা) কথা ও কাজের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়েছে। তারা এ ধরনের সত্যের পথে ভূমিকা রাখা কবি ও কবিতার প্রশংসা করেছেন এবং দীনের স্বার্থে এই শক্তিশালী মাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন। এর মাধ্যমে কবি, কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি ইসলামের ইতিবাচক ও প্রশংসনীয় দৃষ্টিভঙ্গি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

তবে আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথম তিনটি আয়াতে কবি, কবিতা ও সাহিত্য শিল্পের ব্যাপারে আল– কুরআনের নেতিবাচক ও অগ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এর জবাবে বলিষ্ঠভাবে বলা যায় যে, মানবতার জবীন বিধান মহাগ্রন্থ আল–কুরআন

নীতিগতভাবে সাহিত্য শিল্প ও সাহিত্য শিল্পীদের বিরুদ্ধে কোন নেতিবাচক দৃষ্টি পোষণ করেনি, এমনকি এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করেনি। বরং কবিদের মধ্যে বিশেষ একদল কবির বিরুদ্ধে ঘৃণ্য দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে। যারা সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিন্দা করত এবং তার দোষ ও তিরস্কার করে কবিতা আবৃত্তি করত। একইভাবে নীতিভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত কবিদের বিরুদ্ধেও ঘৃণা পোষণ করত যারা তাদের কবিতার মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেআরব সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দিত। আল–কুরআন তাদের সম্পর্কে আর কিছু বৈশিষ্ট তুলে ধরেছে যে, তারা তাদের অলিক কল্পনা ও চিন্তার পাগলা ঘোড়ার পেছনে ছুটে বেড়ায়। ভ্রষ্ট আবেগে তাড়িত হয়ে সত্য মিথ্যার পার্থক্য ভুলে যায়। যা খুশী বল্গাহীনভাবে তাই বলে যায়। তাদের কবিতার মাধ্যমে সম্মানী মানুষের সম্মানকে ভেঙ্গে দেয়। নারীদেরকে উলঙ্গ করে ছাড়ে। সতী–সাধবীদের প্রতি কুৎসা রটনা করে। যারা প্রশংসারযোগ্য নয় তাদের প্রসংসা করে। আবার যারা নিন্দাযোগ্য নয় তাদের নিন্দা করে। উপরন্ত তারা যা করে না তাই তারা বলে। দানশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করে কিন্তু নিজেরা তার ধারে কাছে নেই আর কৃপণতাকে প্রচন্ড ঘৃণ্য রূপে তুলে ধরে অথচ নিজেরা সাংঘাতিক কৃপণ।

কিন্তু এরপরই আল্লাহ তা'আলা কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্টসম্পন্ন কবিদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা পূর্বোক্ত তিনটি আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্টের বিপরীত। তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান পোষণ করে, তাঁর হিদায়াতের পথে চলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করে এবং সর্বদা তার পথের উপরে চলে। তাদের সকল শক্তি দিয়ে সত্য কথা ও ভাল কর্ম করে। তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কথা স্মরণ করে এবং তাঁর যাবতীয় নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করে। আল–কুরআন এসব কবিদেরকে পূর্বোক্ত বৈশিষ্টসম্পন্ন কবিদেরমত আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানায়নি। এদেরকে ভ্রান্ত কবিদের থেকে পৃথক করেছে। অন্যান্য কবিদের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছে, তাদের সম্মানকে সুউচ্চে তুলে ধরেছে।

একইভাবে উপর্যুক্ত যে হাদীসে 'কবিতা দিয়ে পেট ভর্তির চেয়ে ক্ষতিকর পুঁজ দিয়ে পেট ভর্তি করা শ্রেয়ঃ' এ হাদীস দ্বারাও ঐসব কবিতাকে বুঝানো হয়েছে, যে কবিতাগুলো কবির অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে তার মন জয় করে নেয় এবং কবিকে ঈমান, নেক 'আমল, দীনদারী, দীনের বিধি–বিধান মেনে চলা, আল্লাহর স্মরণ করা ইত্যাদি থেকে উদাসীন করে রাখে। বরং যে কবিতায় সত্যের অপলাপ, চরিত্র হনন, অনৈতিকতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতার প্রচার, মিথ্যার প্রচলন, দীন– আকীদা– বিশ্বাসের ধ্বংস করা, শিরক–বিদ'আতের প্রচলন করা, অপসংস্কৃতিকে উসকে দেয়া এবং সত্য দীনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া ইত্যাদি খারাপ ও মন্দ বিষয়কে সমাজে তুলে ধরে সেই কবিতাকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম আল– বুখারী তার সাহীহুল বুখারীতে একটি পরিচ্ছেদের শিরনাম দিয়েকবিতার প্রশংসার পক্ষে সাহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন;

بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الغَالِبَ عَلَى الإِنْسَانِ الشِّعْرُ، حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالعِلْمِ وَالقُرْآنِ

কোন মানুষের উপর কবিতার এমন প্রভাব বিস্তার করা, যা তাকে আল্লাহর স্মরণ, জ্ঞান এবং আল– কুরআন থেকে বিরত রাখে তা ঘৃণ্য', [সাহীহুল বুখারী ৮/৩৬]।

উপর্যুক্ত যেসব আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কবি ছিলেন না সে বিষয়টিকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে প্রকাশ্যে কবি ও কবিদেরকে ছোট করে দেখা হয়নি আবার তাদেরকে অবমূল্যায়নও করা হয়নি। এক্ষেত্রে যদি কবি ও কবিতাকে অবমূল্যায়ন করা হতো তাহলে স্পষ্ট করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবধান করতেন। এসব আয়াতে কাফিরগণ রাসূলুল্লাহর কবি হওয়ার যে কালিমা লেপন করে আল–কুরআনকে কবিতা সাদৃশ বস্তু সাব্যস্ত করার মাধ্যমে তাদের কথিত কবিতা এবং আল–কুরআনের বাণী কবিতার মতই একটা কিছু, এমন ধারণা করে আল– কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করার বিরুদ্ধে বলিষ্টভাবে রাসূলের কবি হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, তিনি কবি ছিলেন না এবং কবিতা বলা বা রচনা করা তার জন্য শোভনীয় নয়। সুতরাং যেসব কবিতা কবিদেরকে আল্লাহর স্মরণ, দীন ও কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে অন্তরায় হয় তা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে যে সাহিত্য দীনের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসেবে কাজ করে সেটা তো নিষিদ্ধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না বরং জান, মাল এবং জিহ্বা আর ভাষা দিয়েও আল্লাহর পথে জিহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শিক্ষাসমূহঃ

এ আয়াতগুলোর উল্লেখযোগ্য শিক্ষা হচ্ছে;

এক. সাহিত্য– সংস্কৃতি ও এর অনুষঙ্গগুলো হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় –উপকরণ, এটিকে মন্দকাজে ব্যবহার করলে তাহবে চরম ঘৃণিত, তিরস্কৃত এবং শাস্তিযোগ্য। ইসলাম তা কখনো অনুমোদন দেয় না। তাই সাহিত্য আমোদী ও চর্চাকারী মু'মিনদের সর্বদা এ কথা মনে করে চলা উচিত।

দুই. কবিতা ও কাব্যকে সত্য প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করা হলে তা গ্রহণযোগ্য এবং অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বরং আল্লাহর তা'আলার দীন প্রতিষ্ঠা এবংদীনের দুশমনদের প্রতিহত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ মাধ্যম ব্যবহার করে জিহাদ ফী সাবীল্লিাহর কাজ করা সংশ্লিষ্ট মু'মিনদের ঈমানী কর্তব্য।

মহান আল্লাহ সকল মু'মিন ও মুসলিমদেরকে এই সাহিত্য, কবিতা ও কাব্যকেও দীনের স্বার্থে ব্যবহার করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

দারসুল হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

অনুবাদ : "আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দু'শ্রেণির লোক জাহান্নামী হবে, যাদেরকে আমি দেখিনি : ঐ সম্প্রদায়, যাদের সাথে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, যা দ্বারা লোকদেরকে প্রহার করবে। ঐ সকল নারী যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ, অন্যকে বিপথগামী করে এবং নিজেরাও বিপথগামী, আর মাথা উটের দুল খাওয়া কুঁজের মত। এরা কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার ঘ্রাণও পাবে না, যদিও তার ঘ্রাণ বহু দূর থেকে পাওয়া যাবে।[১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীছে দু'শ্রেণির লোকের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যারা জাহান্নামী হবে। তবে এ দু'শ্রেণির লোক রাসূলুল্লাহ (সা.) শাসনকালে ছিল না। পরবর্তিতে তাদের উদ্ভব ঘটবে বলে হাদীছে ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে এবং পরবর্তিতে তাদের উদ্ভব হয়েছে। এটি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর একটি মু'জিযা। প্রথম শ্রেণি হলো জালিম শাসক-প্রশাসক, প্রতিপত্তিশালী শ্রেণি, যারা সর্বদা লোকদেরকে নিপীড়ন করে, যাদের অত্যাচারে লোকেরা অতিষ্ট অথবা তটস্থ। এ শ্রেণির লোকেরা জাহান্নামে যাবে। কারণ মানুষকে নিপীড়ন করা বা কষ্ট দেওয়া ঈমান ও ইসলামের পরিপন্থী কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»

মুসলিম সে ব্যক্তি, যার কথা ও হাত (কাজ) থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষিদ্ধ করা কাজকে বর্জন করে।[২] অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعَذِّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا

নিশ্চয় মহাপরাক্রমশালী, মর্যাদাবান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেবেন, যারা দুনিয়াতে মানুষকে শাস্তি দেয়।[৩] এমন কি যারা কথা বা আচরণের দ্বারও কাউকে কষ্ট দেয়, তারাও জাহান্নামী হবে বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فُلَانَةَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا فَقَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهَا هِيَ فِي النَّارِ» ، قِيلَ: فَإِنَّ فُلَانَةَ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَتَصَدَّقُ بِأَثْوَارٍ مِنْ أَقِطٍ وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا بِلِسَانِهَا قَالَ: «هِيَ فِي الْجَنَّةِ»

---

১. মুসলিম, কিতাবুল লিবাস, বাবুন নিসায়িল কাসিয়াতিল 'আরিয়াতিল মায়িলাতিল মুমিলাতি, হাদীছ নং- ২১২৮ (১২৫)।
২. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাবু আল মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা মিল লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি, হাদীছ নং ১০।
৩. শো'আবুল ঈমান, হাদীছ নং ৪৯৭০।

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সা.)কে বলা হলো, অমুক মহিলা দিনে সাওম পালন করে এবং রাত জেগে 'ইবাদাত করে, কিন্তু সে তার কথার দ্বারা প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, এতে তার কোনো কল্যাণ নেই, সে জাহান্নামী। বলা হলো, অমুক মহিলা ফরজ সালাত আদায় করে এবং রামাযানে সিয়াম পালন করে এবং পনিরের কিছু টুকরা দান করে, কিন্তু সে কথার দ্বারা কাউকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী।[৪]

সুতরাং শাসক, প্রশাসক, আইনশৃংখলা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও অন্যান্য সকলকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে তাদের দ্বারা অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তি কষ্ট বা শস্তি না পায়। অন্যথায় আখিরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

অন্য আরেকটি শ্রেণি যারা জাহান্নামে যাবে তারা হলো নারী। এরা সে সকল নারী, যারা অসৎ কর্মপরায়ণ ও ফাসিক-ফাজির। এরা আল্লাহর বিধানের কোনো তোয়াক্কা করেনা। এরা নিজের নফসের ও শয়তানের তাবেদার। ফলে তাদের কাজ-কর্ম, চলাফেরা ইত্যাদি হয়ে থাকে শালীনতা ও আল্লাহর বিধি-বিধান বিবর্জিত। এরা পর্দার বিধান বা ইসলামের বিধানের কোনো ধার ধারে না। নিজের দেহ ও পোষাক পরিচ্ছদ আকর্ষণীয় করে অন্য পুরুষের সামনে প্রকাশ করাকে এরা ফ্যাশন হিসেবে গ্রহণ করে। এরা দেহের বিভিন্ন অংশ খোলা রেখে বাইরে চলাফেরো করে। হাদীছটিতে এদের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাহলো, কাপড় পরেও উলঙ্গ। অর্থাৎ এরা শরীরের কিছু অংশ আবৃত করে এবং কিছু অংশ খোলা রাখে। অথবা এমন পাতলা কাপড় পরিধান করে যার ভিতর দিয়ে শরীর দেখা যায়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এরা আল্লাহর নি'য়ামত ভোগ করে কিন্তু তার শুকরিয়া আদায় করে না।

এরা লোকদেরকে বিপথগামী করে। অর্থাৎ এরা এদের মন্দ কাজ অন্যকেও অবহিত করে এবং অন্যদেরকে সে দিকে আকৃষ্ট ও আহবান করে বিপথগামী করে।

এরা নিজেরাও বিপথগামী। অর্থাৎ এরা আল্লাহর আনুগত্য ও তাদের জন্য যা মেনে চলা আবশ্যক, তা থেকে বিচ্যুত হয়ে ভ্রান্ত পথে নিজেকে পরিচালিত করে। অথবা এরা নষ্টা মেয়েদের মত বিকৃত ভঙ্গিতে হেলে দুলে চলে।

উটের দুল খাওয়া কুঁজের মত এদের মাথা। অর্থাৎ এরা কাপড় বা অন্য কিছু দিয়ে মাথার খোপাকে উঁচু ও বড় করে প্রদর্শন করে।

এ ধরনের বেপর্দা ও বেহায়া নারীরা জান্নাতে যেতে পারবে না। জান্নাতে যাওয়া দূরে থাক, এরা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবেনা।

নারী পুরুষ মিলেই মানবজাতি। এ দু'য়ের পরস্পর মিলনেই মানবধারা বহমান। একটি নারী এবং একটি পুরুষের মিলনের ফলেই পরিবার গঠিত হয়। পরিবার থেকেই সমাজের সৃষ্টি। এ উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতায় সমাজ ক্রিয়াশীল। সমাজের শৃংখলা, স্থিতি ও স্থায়িত্ব এবং শান্তি ও স্বস্থির জন্যই নারী-পুরুষের মিলনকে বিধিবদ্ধ নিয়মের নিগড়ে বেধে দেওয়া হয়েছে। বিধিবদ্ধ নিয়মের বাইরে নারী-পুরুষের অবাধ মেলমেশা বিশৃংখলার জন্ম দেয় এবং ফলশ্রুতিতে সমাজের স্থিতি ও শান্তি বিনষ্ট হয়। এজন্য ইসলাম নারী-পুরুষের অবৈধ ও অবাধ মেলামেশাকে নিষিদ্ধ করেছে। এ অবাধ মেলামেশা রোধকল্পেই পর্দা প্রথার প্রবর্তন করা হয়েছে, যাতে বিধিবহির্ভূতভাবে মিলিত হয়ে বিশৃংখলার জন্ম দিতে না পারে।

এটিকে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আমরা জানি যে, বিদ্যুতের দু'টি ধারা থাকে। একটি পজেটিভ এবং অন্যটি নেগেটিভ। এ দু'টি ধারাকে বিশেষ নিয়মে

---

[৪]. হাকিম, আল মুস্তাদ্‌রাক 'আলাস সাহীহাইন, হাদীছ নং ৭৩০৫।

সংযোজিত করলে তা থেকে আমরা আলো ও শক্তি পাই। কিন্তু বিশেষ নিয়মের বাইরে এ দু'টি মিলিত হলে দুর্ঘটনা ঘটে এবং কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ সাধিত হয়। এজন্য এ দু'টি ধারাকে সাধারণভাবে পৃথক রাখার লক্ষ্যে তাদের গায়ে আবরণ দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে এ দু'টি যত্র-তত্র মিলিত হয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে না, কিন্তু বিশেষ নিয়মে মিলিত করে তা থেকে প্রভূত কল্যাণ লাভ করা সম্ভব হচ্ছে।

অনুরূপভাবে মানব জাতির ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং এর স্থিতি ও কল্যাণের জন্য নারী ও পুরুষ এ দু'টি ধারা তৈরী করা হয়েছে। এ দু'টি ধারাকে একত্রিত করে বংশধারা অব্যাহত রাখা, শান্তি ও স্থিতি বজায় রাখা এবং এর মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন এবং সভ্যতার উদ্ভব ও বিস্তার ঘটানো অব্যাহত রাখা হয়েছে। ইসলাম বিবাহের মাধ্যমে এ দু'টি ধারাকে এক জায়গায় মিলিত বা একত্রিত করেছে। অর্থাৎ বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে নারী পুরুষকে মিলিত করে যৌন সম্ভোগের ব্যবস্থা করেছে। এর বাইরে নারী পুরুষের মিলনের সুযোগ রাখা হয়নি, বরং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদি এ সুযোগ রাখা হতো তাহলে তা একদিকে যেমন বিশৃংখলার জন্ম দিত, অন্য দিকে তেমনি মানব বংশ কলংকিত ও সংন্দেহ-সংশয়িত হত এবং স্থিতি, শান্তি ও সভ্যতা বিনষ্ট হত, কল্যাণ ও শান্তির পরিবর্তে অকল্যাণ ও অশান্তির ক্রমধারা প্রবাহিত হতে থাকতো।

ইসলাম যে কাজকে নিষিদ্ধ করেছে, সে কাজের মাধ্যম বা সে কাজের দিকে পৌঁছার সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে মানুষ সে দিকে ধাবিত হতে না পারে। কারণ কোন বস্তুকে হারাম ঘোষণা করে তার নিকট পৌঁছার মাধ্যম ও পন্থাসমূহকে বৈধ ও উন্মুক্ত করে দিলে তা হবে স্ববিরোধিতা, হারাম ঘোষণাকে পণ্ড করার শামিল এবং নাফস বা প্রবৃত্তিকে উক্ত হারাম কাজের প্রতি অনুপ্রেরণা দানকারী। আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞা এটিকে কোন ক্রমেই স্বীকৃতি দিতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কায়্যিম বলেন,

"মহান প্রভূ যখন কোন কিছু হারাম ঘোষণা করেন, যার দিকে পৌঁছার বিভিন্ন পথ ও উপকরণ রয়েছে, তখন তিনি সে পথগুলোকেও হারাম করে দেন এবং তা থেকে বারণ করেন, যাতে সে হারামটি প্রকৃত:পক্ষেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর এজন্য তিনি তার সীমানার কাছে যেতেও আমাদেরকে নিষেধ করেন।"[৫] তিনি আরো বলেন,

"যদি হারামের দিকে ধাবিতকারী কারণ ও মাধ্যমসমূহ বৈধ রাখা হত, তাহলে তা হত হারামকে পণ্ডকারী এবং নফস বা প্রবৃত্তিকে সেদিকে অনুপ্রেরণা দানের শামিল। আর আল্লাহর হিকমাত ও জ্ঞান এটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।"[৬]

ইমাম খাত্ত্বাবী (রহ.) বলেন, كل امر يتذرع به الى محظورة فهو محظور "প্রতিটি বিষয়, যা নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যম হয়, তাও নিষিদ্ধ।"[৭]

হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার জন্য সেদিকে যাওয়ার সকল পথ বন্ধ করে দেয়া জরুরী, যাতে লোকেরা সেদিকে যাওয়ার কোন বাহানার অবকাশ না পায়।

মোট কথা বিজ্ঞ শারী'আত প্রণেতা ক্ষতিকর বস্তু ও বিষয়সমুহ নিষিদ্ধ করেছেন এবং সাথে সাথে সে দিকে যাওয়ার সকল পথ ও মাধ্যমগুলোও বন্ধ করে দিয়েছেন। বিপর্যয়কর ও অনিষ্টকর বস্তুগুলোকে যেমন হারাম করা হয়েছে, তেমনিভাবে সেগুলোর দিকে পৌঁছার মাধ্যম ও উপায় উপকরণকেও হারাম করা হয়েছে। এটি শারী'আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।

---

৫. ইবনুল কায়্যিম, ই'লামুল মু'আক্কি'ঈন আন রাব্বিল 'আলামীন, খ. ৩, পৃ. ১৭৫।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মাদ, মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুয যাকাত, প্রথম ফসল, পৃ. ১৫৬।

জিনার দিকে উদ্বুদ্ধকারী মাধ্যম এবং পন্থাও নিষিদ্ধ

শারী'আতের উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে জিনা-ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে এর প্রতি প্ররোচনাদানকারী ও উদ্বুদ্ধকারী সবকিছুকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং জিনা-ব্যভিচারের দিকে পৌঁছার সকল চোরাপথ বন্ধ করে দিয়েছে। জিনাকে নিষিদ্ধকারী হুকুম وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا -"আর তোমরা জিনার ধারে-কাছেও যেওনা, কারণ এটি অশ্লীল ও জঘন্যতম পথ"[৮] নাযিল করার সাথে সাথে জিনার দিকে আকৃষ্টকারী পথসমূহ বন্ধের প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। এ বিধি-নিষেধের সমষ্টিই হলো হিজাব বা পর্দা ব্যবস্থা।

পর্দার বিধান :

হিজাব বা পর্দার বিধানকে ইসলাম ফরয করে দিয়েছে। আর এর মূল লক্ষ্য হলো যাতে নারী-পুরুষ অননুমোদিত পন্থায় পরস্পরের সান্নিধ্যে আসতে না পারে। কারণ এটিই ক্রমান্বয়ে তাদেরকে যিনার দিকে ধাবিত করে। এ জন্য এ পথে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে নিষিদ্ধ স্থানে পৌঁছাতে না পারে। নিম্নে এগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো,

১. ইসলাম নারী ও পুরুষের অবস্থান এবং কর্মক্ষেত্র পৃথক করে দিয়েছে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নারী-পুরুষের সাক্ষাৎ, অযথা কথাবার্তা ও আলাপচারিতা, ঠাট্টা-মশকরা ও রসিকতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ

"হে ঈমানদারগণ, পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদের বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। অনুরূপভাবে নারীরাও যেন অন্য নারীদেরকে বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম।"[৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 'আল্লামা সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) বলেন, "পুরুষ ও নারীদের কথা আলাদা করে উল্লেখ করার অর্থ এ নয় যে, পুরুষদের নারীদেরকে বিদ্রুপের লক্ষ্য বানানো এবং নারীদের পুরুষদেরকে হাসি তামাশার লক্ষ্য বানানো জায়িয। মূলত যে কারণে নারী ও পুরুষদের বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, ইসলাম এমন সমাজ আদৌ সমর্থন করে না, যেখানে নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করতে পারে। অবাধ খোলামেলা মজলিসেই সাধারণত: একজন আরেকজনকে হাসি-তামাসার লক্ষ্য বানাতে পারে। মুহাররাম নয় এমন নারী-পুরুষ কোন মজলিসে একত্র হয়ে পরস্পর হাসি-তামাসা করবে, ইসলামে এমন অবকাশ আদৌ রাখা হয়নি। তাই একটি মুসলিম সমাজে একটি মজলিসে পুরুষ কোন নারীকে উপহাস ও বিদ্রুপ করবে কিংবা নারী কোন পুরুষকে বিদ্রুপ ও উপহাস করবে এমন বিষয় কল্পনার যোগ্য মনে করা হয়নি।[১০]

২. ইসলাম নারীদেরকে বাড়ীতে অবস্থান করতে বলেছে। কোনো প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে সাজসজ্জা করে আকর্ষণীয়রূপে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

"তোমরা তোমাদের গৃহেই অবস্থান কর এবং প্রথম জাহিলী যুগের নারীদের মত খোলামেলাভাবে বের হয়োনা।"[১১]

---

৮. ১৭-সূরা বানী ইসরাঈল : ৩২
৯. ৪৯-সূরা আল হুজুরাত : ১১
১০. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হুজুরাত, টীকা নং ২০, খ. ১৫।
১১. ৩৩-সূরা আহযাব : ৩৩

৩. কোনো প্রয়োজনে বের হতে হলে ভালভাবে শরীর ঢেকে বের হতে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর ঘোষণা হলো,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং মুমিন নারীদেরকে বলে দিন তারা যেন নিজেদের উপর চাদর টেনে নেয়।"[১২]

৪. চলতে ফিরতে নারী-পুরুষের পরস্পরে সাক্ষাৎ ঘটলে স্ব-স্ব দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হিফাজত করে। এটাই তাদের পরিশুদ্ধির জন্য সর্বোত্তম। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে খবরদার। আপনি মুমিন নারীদেরকেও বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হিফাজত করে। আর তারা যেন স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশিত থাকে, তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং বুকের উপর চাদর জড়িয়ে চলাফেরা করে। আর স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগিনীপুত্র, নিজস্ব বলয়ের নারী, অধিনস্ত ক্রীতদাস, তাদের অনুসারী যৌন অনুভূতিহীন পুরুষ এবং মহিলাদের গোপনীয় বিষয়ে অবহিত নয় এমন শিশু ব্যতীত অন্য কারো নিকট যেন তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর পথ চলতে তারা যেন এমনভাবে পা না ফেলে, যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য জানা যায়। মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[১৩]

৫. নারীদের নিকট পুরুষদের কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"যখন তোমরা তাদের (নবী পত্নীগণের) নিকট কোনো কিছু চাও, তা চাও পর্দার আড়াল থেকে, এটাই তোমাদের এবং তাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতম।"[১৪]

৬. একান্ত প্রয়োজনে কোনো নারীকে কোনো পুরুষের সাথে কথা বলতে হলে, অত্যন্ত শালীনতা ও সতর্কতার সাথে কথা বলতে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

---

১২. ৩৩-সূরা আহযাব : ৫৯
১৩. ২৪-সূরা আন্ নূর : ৩০-৩১
১৪. ৩৩-সূরা আহযাব : ৫৩

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"হে নবী পত্নীগণ, তোমরা অন্য কোনো নারীর মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাক, তাহলে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, যাতে ব্যধিগ্রস্ত অন্তরের লোকেরা লোভাতুর হয়ে পরে, আর তোমরা কথা বলবে সঙ্গতভাবে।"[১৫]

৭. নারীদেরকে স্বামী বা মাহরাম কোন পুরুষ ছাড়া একাকী সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি হজ্জের উপযোগী হলেও স্বামী বা মাহরাম পুরুষ ব্যতীত হজ্জে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"ইবন 'উমার (রা.) বর্ণনা করেন, নাবী (সা.) বলেন, কোন মহিলা মাহরাম ব্যক্তিকে সাথে না নিয়ে তিন দিনের সফরে যেতে পারবে না।"[১৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

"আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, নাবী কারীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী কোনো নারীর জন্য এক দিন এক রাত সফর করা জায়িয নয়, যদি না তার সাথে কোন মাহরাম ব্যক্তি থাকে।"[১৭]

৮. মাহরাম পুরুষের উপস্থিতি ব্যতীত নারী-পুরুষের একান্তে সাক্ষাৎকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ

"'উকবা ইবন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, নারীদের নিকট প্রবেশ থেকে তোমরা সাবধান থেকো। আনসারদের জনৈক ব্যক্তি বলল, দেবরের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, দেবর তো যমতুল্য।"[১৮]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"ইবন 'আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, নাবী কারীম (সা.) বলেন, মাহরাম ব্যক্তি ব্যতীত কোনো পুরুষ যেন কোনো পর নারীর সাথে একাকী সাক্ষাৎ না করে।"[১৯]

৯. অনুমতি ব্যতীত অন্যের ঘরে বা বাড়ীতে প্রবেশ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এতে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থানরত নারীদের সঙ্গে পর্দাহীন অবস্থায় সাক্ষাৎ ঘটবে যা মোটেও কাম্য নয়। অধিকন্তু অন্যের গৃহে অবাধে প্রবেশের সুযোগ নারী-পুরুরের অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টিসহ নানা ধরনের অঘটন ঘটানোর অনুঘটক হিসেবে কাজ করে থাকে। এজন্য ইসলাম একে

---

১৫. ৩৩-সূরা আহযাব : ৩২

১৬. বুখারী, কিতাবুস সালাত, বাবু ফি কাম ইউকসারুস সালাত; মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ, বাবু সাফরিল মার্আতি মা'আ মাহরামিন ইলা হাজ্জিন ওয়া গাইরিহি।

১৭. প্রাগুক্ত।

১৮. বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, বাবু লা-ইয়াখলুআন্না রাজুলুন বি ইমরাআতিন ইল্লা যু মাহরামিন।

১৯. প্রাগুক্ত।

সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না অনুমতি গ্রহণ কর এবং গৃহবাসীর উপর সালাম প্রদান কর। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আশা করা যায় যে, এটি তোমরা স্মরণ রাখবে।"[২০] এমন কি নিজের মা-বোনের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিতে হবে।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْذِنُوْا عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ.

"ইবন মাস'উদ (রা.) বলেন, তোমাদের মাতা এবং ভগ্নিদের নিকট প্রবেশ করতেও অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।"[২১]

ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনটি আয়াতকে লোকেরা অস্বীকার করে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই সর্বাধিক সম্মানিত যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে'[২২] অথচ লোকেরা বলে, 'আল্লাহর নিকট সেই বেশি সম্মানী যার বাড়ী সবচেয়ে বড়'। তিনি (ইবন 'আব্বাস) বলেন, অনুমতির বিষয়টি লোকেরা পুরোপুরিই অস্বীকার করে। 'আতা ইবন আবু রিবাহ বলেন, আমি বললাম, আমার গৃহে আমার ইয়াতিম বোনেরা, যারা আমার সাথে একই বাড়ীতে থাকে, তাদের নিকট প্রবেশ করতেও কি আমি অনুমতি চাইব? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমাকে এর (বিনা অনুমতিতে প্রবেশের) অবকাশ দেওয়ার জন্য পুনরায় বললে, তিনি তা অস্বীকার করে বললেন, তুমি কি তাদেরকে উলঙ্গ দেখতে পছন্দ করবে? আমি বললাম না, তিনি বললেন, তাহলে অনুমতি নাও। 'আতা বলেন, আমি পুনরায় বিষয়টি উপস্থাপন করলে তিনি বললেন, তুমি কি আল্লাহর আনুগত্য করতে পছন্দ কর? আমি বললাম জী, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে অনুমতি নাও।"[২৩]

عَن عَ ٰاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَ لَهَا خَادِمٌ غَيْرِي، أَفَأَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا كُلَّمَا دَخَلْتُ؟ قَالَ: "أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ " قَالَ الرَّجُلُ: لَا. قَالَ: "فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا".

'আতা ইবন ইয়াসার থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নাবী (সা.) কে বলল, আমি কি আমার মায়ের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি চাইবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, আমি ছাড়া তার সেবা করার আর কেউ নেই। এক্ষেত্রে আমি যতবার যাব ততবার কি তার কাছে অনুমতি নেব? তিনি বললেন, "তুমি কি তাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে পছন্দ করো? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে তার নিকট যেতে অনুমতি নাও।"[২৪]

১০. দরজা বা জানালা দিয়ে অন্যের গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মেরে দেখাও নিষিদ্ধ।

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ

---

২০. ২৪-সূরা আন-নূর: ২৭

২১. ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আজীম, সূরা আন নূর ২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।

২২. ৪৯-সূরা আল-হুজুরাত : ১৩

২৩. প্রাগুক্ত।

২৪. ইবন জারীর, তাফসীরে তাবারী, সূরা নূর, ২৭ নং আয়াতের তাফসীর দ্র.।

"আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, আবুল কাসিম (সা.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি তোমার অনুমতি ব্যতিত তোমার গৃহে উঁকি দেয়, আর তুমি যদি পাথর নিক্ষেপ করে তার চোখ উপরে ফেল, তাহলে তোমার কোনো দোষ নই।"[২৫]

১১. পর নারী/ পর পুরুষের সঙ্গে মুসাফাহা বা করমর্দন নিষিদ্ধ

ইসলামের দৃষ্টিতে গাইরি মাহরাম বা যে সকল নারী-পুরুষের মধ্যে পরস্পরে বিবাহ বৈধ, সে সকল নারী-পুরুষে পরস্পরে মুসাফাহা করা জায়িয নয়। অর্থাৎ এ ধরনের নারীর পুরুষের সঙ্গে এবং পুরুষের নারীর সাথে মুসাফাহা বা করমর্দন জায়িয নয়। শারী'আতের দৃষ্টিতে এটি সম্পূর্ণ নাজায়িয। যারা এ ধরনের মুসাফাহা করবে তারা কবীরা গুনাহের অধিকারী হবে। এ ব্যাপারে হাদীছের বর্ণনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالكَلاَمِ بِهَذِهِ الآيَةِ: {لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12]، قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا "

"'আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 'তারা (নারীরা) আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না'-এ আয়াতের আলোকে নারীদের বাই'আত গ্রহণ করতেন কথার দ্বারা। তিনি ('আয়িশা) বলেন, আল্লাহর রাসূলের হাত কখনো অধিনস্থ কোনো নারী (স্ত্রী বা ক্রীতদাসী) ব্যতীত অন্য কোনো নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি।"[২৬]

"উমাইমা বিনতে রুকাইকা বলেন, আমি একদল মহিলার সাথে আল্লাহর রাসূল (সা.) এর নিকট বাই'আত করার জন্য আগমন করলাম। তারা (মহিলারা) বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমরা আপনার নিকট এ মর্মে বাই'আত করছি যে, আমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করব না, চুরি করব না, যিনা করব না, আমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করব না, আমাদের দু'হস্ত ও পদদ্বয়ের মাঝখান (অন্তর) হতে কারো প্রতি কোনো অপবাদ দিব না এবং কোনো ভাল কাজে আপনার অবাধ্য হবো না। একথা শুনে রাসূল (সা.) বললেন, তোমাদের যতটুকু শক্তি-সামর্থ আছে সে অনুযায়ী তা পালন কর। উমাইমা বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের নিজেদের চেয়েও আমাদের প্রতি অধিকতর দয়াশীল। হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আসুন, আমরা আপনার নিকট বাই'আত করি। আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন, আমি কোনো মহিলার সাথে কখনো মুসাফাহা করিনা। নিশ্চয়ই আমার কথা একজনের জন্য যেমন প্রযোজ্য তেমনি শত মহিলার জন্যও প্রযোজ্য।"[২৭]

১২. বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা নিষিদ্ধ। বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে মানুষের নৈতিক স্খলন ঘটায় বলে এটিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"নিশ্চয়ই যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তারে তৎপর তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।[২৮]

---

২৫. বুখারী, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু মানিত্তালা'আ ফি বায়তি কাওমিন ফা-ফাকাউ 'আইনাহু ফালা দিয়াতা লাহু,হাদীছ নং ৬৯০২:।

২৬. বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাবু বাই'আতিন নিসা, হাদীছ নং ৭২১৪।

২৭. সুনানুন্ নাসাঈ, কিতাবুল বায়'আত, বাবু বায়'আতিন নিসা; ইবন হাব্বান, কিতাবুস্ সিয়ার, বাবু বায়'আতিল আয়িম্মা ওয়ামা ইয়াস্তাহিব্বু লাহুম।

২৮. ২৪-সূরা আন-নূর : ১৯

১৩. যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা। উপর্যুক্ত প্রতিরোধমূলত ব্যবস্থার পরও যদি কেউ এ জঘণ্যতম কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে ইসলাম তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)

"ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের প্রত্যেককে একশতটি বেত্রাঘাত কর। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে তাদের ক্ষেত্রে যেন তোমাদের কোনো অনুকম্পা না জাগে। আর তাদের শাস্তি যেন মুমিনদের একটি দল প্রত্যক্ষ করে।"[২৯]

বিবাহিত নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে এ দণ্ড আরো কঠোর। এ ধরনের নারী-পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে রজম অর্থাৎ পাথর মেরে মৃত্যু দণ্ড দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে।

এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম যিনা-ব্যভিচার থেকে লোকদেরকে বিরত রাখার জন্য কতটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং কতটা সর্বাত্মক প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে।

নারীদের হিযাব :

উপরোক্ত আলোচনার ২নং ধারায় নারীদেরকে গৃহেই অবস্থান করতে বলা হয়েছে। ৩, ৪, এবং ৫ নং ধারায় বাইরে বের হওয়ার সময় সম্পূর্ণ শরীর ভালভাবে ঢেকে রাখতে, স্বামী বা মাহরাম পুরুষ ব্যতিত অন্য কারো সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে এবং নারীদের নিকট কোনো কিছু চাইতে হলে পর্দার আড়াল থেকে চাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, নারীদের পুরো শরীরই হিযাবের অন্তর্ভূক্ত। স্বামী বা মাহরাম পুরুষ ব্যতিত অন্যদের সামনে পুরো শরীরই ঢেকে রাখতে হবে।

শর'ঈ পর্দার শর্তসমূহ :

শর'ঈ পর্দার প্রয়োজনীয় কতিপয় শর্ত রয়েছে। সেগুলো হলো,

১. পর্দার জন্য কাপড়টি এমন হতে হবে, যা পুরো শরীরকে ভালভাবে ঢেকে দেবে। পুরো শরীর না ঢাকলে তা শর'ঈ পর্দা বলে গণ্য হবে না।

২. পর্দার জন্য ব্যবহৃত কাপড়টি মোটা হতে হবে। কারণ পর্দার উদ্দেশ্য হলো ঢেকে রাখা। যদি কাপড়টি এমন পাতলা হয়, যা দৃষ্টিকে বাধাগ্রস্ত করতে সক্ষম নয় অর্থাৎ যে কাপড়ের মধ্য দিয়ে শরীর দেখা যায়, এমন কাপড় পরিধান করলে তা শর'ঈ পর্দা বলে গণ্য হবে না।

৩. কাপড়টি উজ্জল রং এর, চকচকে ও এমন সুন্দর না হওয়া, যা পর পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ পর পুরুষের দৃষ্টি থেকে সৌন্দর্যকে ঢেকে রাখার জন্যই পর্দা। এখন পর্দা যদি নিজেই আকর্ষণীয় হয়, তাহলে তা অন্যের আকর্ষণ না ঠেকিয়ে বরং অন্যকে আরো আকৃষ্ট করবে। সুতরাং তা পর্দা হিসেবে গণ্য হবে না।

৪. তা হতে হবে ঢোলা-ঢালা। আট-সাট ও সংকীর্ণ হলে চলবে না। কারণ তাহলে তা শরীরের সাথে এটে থাকবে এবং তাতে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের আকার-আকৃতি বুঝা যাবে, যা আকর্ষণ সৃষ্টি ও ফিৎনার কারণ হতে পারে। সুতরাং কাপড়টি এমন ঢোলা-ঢালা হতে হবে, যাতে বাইরে থেকে শরীরের আকার-আকৃতি বুঝা না যায়।

---

২৯. ২৪-সূরা আন-নূর : ২

৫. কাপড়টি সুগন্ধিযুক্ত হওয়া চলবে না। কারণ তা পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করে।

৬. কাপড়টি পুরুষদের কাপড়ের সদৃশ হতে পারবে না অথবা যে সকল কাপর পুরুষদের পরিধানের জন্য নির্দিষ্ট সে সকল কাপড় হতে পারবে না।[৩০]

নারীদের মুখমন্ডলও পর্দার অন্তর্ভূক্ত। মাহরাম ব্যতীত অন্য পুরুষের সামনে এবং কোন প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে যাওয়ার সময় যদি পুরুষের সামনা-সামনি হতে হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে শরীরের অন্যান্য অংশের মত চোখ ব্যতীত নারীদের পূর্ণ মুখমন্ডল ঢেকে রাখা আবশ্যক। অবশ্য সালাত আদায়ের সময় নারীদের মুখ, দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত এবং পায়ের গোড়ালি খোলা রাখার অনুমতি আছে।

সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখা, অশ্লীলতা রোধ করা ও নারীদের নিরাপত্তার জন্যই এ সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। যে নারীরা এ সকল ব্যবস্থার ব্যত্যয় ঘটায় তারা মূলতঃ সামাজিক শৃংখলা বিনষ্ট করে, অশ্লীলতার প্রসার ঘটায় এবং নিজেদের ও অন্যান্য নারীদের ইজ্জত-আব্রু ও জীবনের নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটায়। ইভ টিজিং, শ্লীলতা হানি, ধর্ষণ, ধর্ষণোত্তর হত্যা প্রভৃতির জন্য নারীদের উচ্ছৃংখলভাবে চলাফেরাও অনেকাংশে দায়ী। কারণ যুব মহিলাদের এধরনের উচ্ছৃংখল চলাফেরা বখাটে যুবকদের আকৃষ্ট করে।

এ জন্য ইসলাম পর্দার বিধান লঙ্ঘন করাকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে এবং যারা এ অপরাধে লিপ্ত হবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির হুশিয়ারী দিয়েছে।

মুসলিম নারীদের জন্য পর্দা একটি ফরজ 'ইবাদাত। এটি পালন করলে তারা ফরজ 'ইবাদাতের ছওয়াব পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে পর্দার বিধান পালন না করলে ফরজ লঙ্ঘনের দায়ে প্রতিনিয়ত কবীরা গোনাহের অধিকারী হতে থাকবে। পর্দা প্রতিপালনের মাধ্যমে মুসলিম নারীগণ জান্নাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। অপরদিকে পর্দা লঙ্ঘন করলে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হতে হবে এবং জাহান্নামে যেতে হবে।

ঐ সকল নারী যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ অর্থাৎ এমন পোষাক পরে, যাতে পূর্ণ শরীর আচ্ছাদিত হয়না, বরং শরীরের কিছু কিছু অংশ খোলা থাকে অথবা এমন পাতলা কাপড় পরে, যাতে কাপড়ের ভিতর দিয়ে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায়, তাদেরকে হাদীছে কাপড় পরা স্বত্বেও উলঙ্গ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ এধরনের পোষাক পরা দ্বারা সতর ঢাকা বা পর্দা করা হয়না। যারা আকর্ষণীয় পোষাক পরে, নানা রকম সাজসজ্জা করে, অঙ্গ সৌষ্ঠব প্রকাশ করে অথবা বিভিন্ন অঙ্গ ভঙ্গির মাধ্যমে অন্যকে আকৃষ্টক করে, তারাও পর্দা লঙ্ঘন করে। যারা অহংকারের ভঙ্গিতে হেলে-দুলে পথ চলে এবং যারা মাথার চুলকে উটের কুঁজের মত উঁচু করে খোপা বেধে পর পুরুষের সামনে চলাফেরা করে, তারাও পর্দা লঙ্ঘন করে। এ ধরনের নারীরা জান্নাতে যাওয়া তো দূরের কথা, জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অর্থাৎ তারা হবে জাহান্নামী। উল্লেখিত হাদীছে এ কথাই বলা হয়েছে।

সুতরাং মুসলিম নারীদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। তাদেরকে পোষাক ও চলাফেরার ব্যাপারে ইসলামের নীতিমালা মেনে চলতে হবে। তাহলেই তারা সৌভাগ্যবতি হবে এবং জান্নাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবে।

ড. আবু তাবাসসুম

---

৩০. মুহাম্মদ 'আলী আস সাবুনী, রাওয়ায়ি'উল বায়ান তাফসীরু আয়াতিল আহকাম মিনাল কুরআন, সুরা আহযাব, ৫৯ নং আয়াতের তাফসীর

চিন্তাধারা

শর'ঈ আহকাম প্রণয়নে ইবনুল কায়্যিম (রহ.) এর মূলনীতি

ড. মো. ছামিউল হক ফারুকী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আল্ কুরআনের সঙ্গে সুন্নাহর অবস্থান

আল্ কুরআন এবং সুন্নাহ বা হাদীছ একই উৎস থেকে উৎসারিত। আল্ কুরআন হলো ওহিয়ে মাত্লু এবং আস সুন্নাহ বা হাদীছ হলো ওহিয়ে গাইরি মাত্লু। এ কারণে এ উভয়টি শরী'আর দলীল হিসেবে গৃহীত। সহীহ সুন্নাহ বা সহীহ হাদীছ আল্ কুরআনের বিপরীত হতে পারে না। 'আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল্ কুরআনের সঙ্গে সুন্নাহর অবস্থানকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন :

১. সুন্নাহটি সকল দিক থেকে কুরআনের সম্পূর্ণ অনুকূল হওয়া। সেক্ষেত্রে একই হুকুমের ক্ষেত্রে কুরআন এবং সুন্নাহ উভয়টি একই সাথে দলীল হিসেবে গৃহীত হবে।
২. সুন্নাহ্টি কুরআনের উদ্দেশ্য কি তা বর্ণনা করবে এবং তার ব্যাখ্যা পেশ করবে।
৩. সুন্নাহ্ এমন হুকুমের ওয়াজিবকারী হবে, যা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কুরআন নিশ্চুপ অথবা এমন বিষয়কে হারাম করে, যা হারাম করার ব্যাপারে কুরআন চুপ থেকেছে।

কুরআনের সঙ্গে সুন্নাহর অবস্থান এ তিন প্রকারের বাইরে যেতে পারেনা। সুতরাং সুন্নাহ কোনো দিক দিয়েই কুরআনের বিপরীত হতে পারে না।[৩১]

সুন্নাহতে কুরআনের অতিরিক্ত যে বর্ণনা রয়েছে, তা নবী (সা.) এর স্বতন্ত্র প্রবর্তন, যার আনুগত্য করা ওয়াজিব এবং অমান্য করা জায়িয নয়। আর এটা কুরআনের উপর অগ্রগামী হওয়া নয়; বরং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আনুগত্যের যে নির্দেশ আল্লাহ প্রদান করেছেন তার বাস্তবায়ন। এ ক্ষেত্রে যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আনুগত্য করা না হয়, তাহলে তাঁর আনুগত্য করার কোন অর্থই থাকে না। এবং তাঁর 'বিশেষ আনুগত্য' করার বিষয়টিও তিরোহিত হয়ে যায়। যদি কুরআনের অনুকূল হওয়ার ক্ষেত্র ব্যতীত, কুরআনের অতিরিক্ত রাসূলের বর্ণিত অন্যান্য বিষয়ে আনুগত্য ওয়াজিব না হয়, তাহলে তার জন্য খাস বা বিশেষায়িত কোনো আনুগত্যের অস্তিত্ব থাকে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ "যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করল।" (৪, সূরা আন্ নিসা : ৮০)[৩২]

---

৩১. ইবনুল কায়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন, খ.২, পৃ. ৩১৪
৩২. প্রাগুক্ত. খ. ২, পৃ. ৩১৪-৩১৫

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের।" (৪, সূরা আন্ নিসা : ৫৯)

এ আয়াত উল্লেখের পর ইবনুল কায়্যিম বলেন, "আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে আল্লাহ নির্দেশদানকারী ক্রিয়াটি (اطيعوا) রাসূলের ক্ষেত্রে পুনরায় আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন একথা জানানোর জন্য যে, রাসূলের আনুগত্য স্বতন্ত্র ও স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে আবশ্যক। সুতরাং তিনি যখন কোন আদেশ দিবেন, তখন তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব হবে, তা সে আদেশ কুরআনে থাক অথবা না থাক। কারণ তাকে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং তৎসঙ্গে অনুরূপ আরো বিষয় দেয়া হয়েছে।"[৩৩]

সুন্নাহর স্বতন্ত্র মর্যাদা

ইসলামী শরী'আতে সুন্নাহর আলাদা ও স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে। এ কারণেই সুন্নাহকে ইসলামী জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস বলা হয়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিধি-বিধান ও তার প্রয়োগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে কুরআনের অতিরিক্ত বহু বিষয় রাসূলুল্লাহ (সা.) বিবৃত করেছেন। সেগুলোও ইসলামী বিধানের অন্তভূর্ক্ত এবং শরী'আর পূর্ণতার জন্য আবশ্যক। এ গুলোকে অমান্য করলে ইসলামের বহু বিধান অকার্যকর হয়ে পড়বে। যেমন কোন নারীকে তার ফুফু বা খালার সাথে একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা নিষিদ্ধ হওয়া, বংশীয় সম্পর্কের কারণে যে সকল নারীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ, দুধ পানের সম্পর্কের দিক থেকেও সে সকল নারীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হওয়া, খিয়ারে শর্তের হাদীছ, শোফ'আ বা প্রি-এমশন সংক্রান্ত হাদীছ, দাদীকে উত্তরাধিকার দেয়ার হাদীছ, হায়িজ বা ঋতুমতী নারীর জন্য নামায, রোযা নিষিদ্ধ হওয়া, রমজান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়া, স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রীর শোক পালন করা ইত্যাদি বহু বিষয় যেগুলো আল্ কুরআনের অতিরিক্ত হাদীছ দ্বারা বিধান দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে বিতর নামাযের বিধান হাদীছের দ্বারা দেয়া, যার বর্ণনা কুরআনে নেই।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ

"উসামা ইবন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নাবী (সা.) বলেন, মুসলিম কাফির এবং কাফির মুসলিমের (সম্পত্তির) উত্তরাধিকারী হবেনা।"[৩৪] এ হাদীছটি উম্মাহ গ্রহণ করেছে, অথচ তা কুরআনে বর্ণিত নেই। একজন কন্যার বর্তমানে পুত্রের কন্যা বা পৌত্রী এক ষষ্ঠাংশের উত্তরাধিকারী হওয়ার বিধান, যা কুরআনের অতিরিক্ত হাদীছ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। মাজুসী বা অগ্নি উপাসকদের নিকট থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করা, দ্বিতীয়বার চুরি করলে পা কেটে

---

৩৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫০।

৩৪. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ফারায়িজ, বাবু লা- ইয়ারিছুল মুসলিমুল কাফিরা, হাদীছ নং ৬৭৬৪।

দেয়া ইত্যাদি হুকুম হাদীছ দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে, যা কুরআনের বর্ণনার অতিরিক্ত।[৩৫] এ রকম বহু হুকুম রয়েছে যার বর্ণনা কুরআনে নেই, বরং শুধু হাদীছের বর্ণনার দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এ প্রসংগে ইবনুল কায়্যিম বলেন,

بل احكام السنة التى ليست فى القرأن ان لم تكن اكثر منها لم تنقص عنها.

"কুরআনে নেই বরং সুন্নাহ্র দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, এমন আহকামের সংখ্যা কুরআনে বর্ণিত আহকামের চেয়ে বেশী না হলেও কম নয়।"[৩৬]

হাদীছ থেকেও ইবনুল কায়্যিমের এ মতের সমর্থন মিলে। মিকদাম ইবন মা'দিকারীব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ "জেনে রেখ, আমাকে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে অনুরূপ বিষয় দেয়া হয়েছে।"[৩৭]

'ইরবাজ ইবন সারিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، أَلَا وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ وَعَظْتُ، وَأَمَرْتُ، وَنَهَيْتُ، عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ، أَوْ أَكْثَرُ.

"তোমাদের কেউ কি আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে এ ধারণা করে যে, এই কুরআনে যা রয়েছে তা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন কিছু হারাম করেননি? জেনে রেখ, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি নির্দেশ দেই, উপদেশ দেই এবং কোন কিছু থেকে নিষেধ করি; নিশ্চয়ই সেগুলো কুরআনের অনুরূপ, অথবা তার চেয়েও বেশী।"[৩৮]

ইবনুল কায়্যিম আহকামসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন :

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে যে সকল আহকাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলো এবং

২. সে সকল আহকাম, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সুন্নাহর মাধ্যমে প্রবর্তন করেছেন।[৩৯]

তিনি তাঁর এ মতের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত হাদীছটি দলীল হিসেবে পেশ করেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْعِلْمُ ثَلاثَةٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ قَائِمَةٌ، وَفَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ .

"আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা,) বলেন, জ্ঞান হলো তিন প্রকার : দ্ব্যর্থহীন আয়াত, সুপ্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ এবং ন্যায়ভিত্তিক বন্টন (ফারায়িজ)। এ ছাড়া যা রয়েছে তা অতিরিক্ত।"[৪০] তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাহ গ্রহণ করাকে মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং ঈমানের অংশ বলে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন,

ومعنى شهادة ان محمدا رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه **فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله الا بما شرع**

---

৩৫. ইবনুল কায়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন, খ. ২, পৃ. ৩১৫-৩১৬।

৩৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৬।

৩৭. সোলায়মান ইবন আশআছ, সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু ফী লুযুমিস্ সুন্নাহ, হাদীছ নং ৪৬৯৪।

৩৮. প্রাগুক্ত, কিতাবুল খিরাজি ওয়াল ফাইয়ি ওয়াল ইমারাহ, বাবু তা'শীরি আহলিয্ যিম্মাহ ইযাখ্তালাফূ বিত্তিজারাহ, হাদীছ নং-৩০৫০।

৩৯. ইবনুল কায়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন, খ. ১, পৃ. ৯৩।

৪০. বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ্, কিতাবুল 'ইল্ম, বাবুত্ তাফাক্কুহি ফিদ্ দ্বীন, হাদীছ নং ১৩৬।

"মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হলো, তিনি যা আদেশ করেছে তার আনুগত্য করা, তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা, তিনি যা নিষেধ করেছেন ও যার ভয় দেখিয়েছেন তা বর্জন করা এবং তাঁর প্রবর্তিত পন্থা ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় আল্লাহর 'ইবাদত না করা।"[৪১]

সুতরাং যে সকল বিধি-নিষেধ ও আহকাম কুরআনে নেই, শুধু সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করলে ইসলামী আহকাম ও বিধি নিষেধের অর্ধেক প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কায়্যিম বলেন,

فلو ساغ لنا رد كل سنة زائدة كانت على نص القرأن لبطلت **سنن رسول الله صلى الله عليه و سلم كلها الا سنة دل عليها القرأن**

"কুরআনের দলীলের অতিরিক্ত প্রতিটি সুন্নাহ্কে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ দিলে কুরআন দ্বারা প্রমাণিত সুন্নাহ্ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সকল সুন্নাহ্ বাতিল বলে গণ্য হবে।"[৪২]

সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত হুকুমের অনুসরণ করা বাধ্যতামুলক হওয়ার দলীল

কুরআনে যা নেই এমন বিষয়ে সুন্নাহ দ্বারা কোন হুকুম সাব্যস্ত হলে তার অনুসরণ করা এবং তদানুযায়ী 'আমল করা ওয়াজিব। ইবনুল কায়্যিম এ মতের সপক্ষে অনেকগুলো দলীল পেশ করেছেন। নিম্নে তন্মধ্য হতে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্বাচন করেছেন তাঁর বাণী ও হুকুমসমূহ সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে। সুতরাং তিনি এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে উম্মাহর জন্য যা কিছু প্রবর্তন করেছেন, তার প্রতিটিই আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা এবং শরী'আহ ও দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু পৌঁছিয়েছেন তা কালামে মাত্লু[৪৩] হোক বা সে ওহী যা কালামের অনুরূপ- এতদোভয়ের অনুসরণ বাধ্যতামূলক হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং রাসূলের বাণীর বিরোধিতা করা আল্লাহর বাণীর বিরোধিতা করার শামিল।[৪৪]

২. আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নামায কায়িম, যাকাত আদায়, বায়তুল্লাহর হজ্জ পালন এবং রমজানের রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কুরআন এগুলোর পরিমাণ, পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলী ইত্যাদি বর্ণনা দেয় নাই। এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। সুতরাং উম্মাহর জন্য এগুলো গ্রহণ করা ওয়াজিব, যেহেতু এগুলো আল্লাহর আদেশেরই বিস্তারিত রূপ।[৪৫]

৩. রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বর্ণনার প্রকারভেদ,

ইবনুল কায়্যিম রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বর্ণনার বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ করেছেন। নিম্নে সেগুলো

---

৪১. ইবনুল কায়্যিম, আল্ কাফিয়াতুশ শাফিয়াহ ফিল ইনতিসারি লিল ফিরকাতিন নাজিয়া (বৈরুত : মাকতাবাতুল ইসলামী, ৩ সং, ১৯৮৬ ইং) খ. ১ , পৃ. ২০।

৪২. ইবনুল কায়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন, খ. ২, পৃ. ৩১৬-৩১৭।

৪৩. এখানে কালামে মাতলু বলতে ওহী মাতলুকে বুঝানো হয়েছে। ওহী দু' প্রকার মাতলু ও গাইরি মাতলু। প্রথমটি কুরআন এবং দ্বিতীয়টি হাদীছ। সুতরাং হাদীছও আল্লাহর ওহী। কারণ রাসুল্লাহ (সা.) যা কিছু বলেছেন ওহীর ভিত্তিতেই বলেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে, "তিনি (রাসূল) প্রবৃত্তির অনুবর্তী হয়ে কিছু বলেন না, ইহা মূলতঃ প্রেরিত প্রত্যাদেশ ব্যতীত কিছুই নয়।"(আন্নাজম : ৩-৪)

৪৪. ইবনুল কায়্যিম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২১-৩২২।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২।

বর্ণনা করা হলো :

ক. অস্পষ্টতার পর যখন ওহী নাযিল হয়েছে, সে ওহীকেই তাঁর ভাষায় বর্ণনা করা।

খ. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তার অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করা। যেমন,

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

"যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।" (৬, সূরা আল্ আন'আম : ৮২)

এ আয়াতে জুলুম বলতে শিরককে বুঝানো হয়েছে, যা রাসূল (সা.) বর্ণনা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"তোমরা খাও এবং পান কর, যতক্ষণ না ভোরের শুভ্র রেখা (রাতের) কালো রেখা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।" (২, সূরা আল্ বাকারা : ১৮৭)

এখানে শুভ্র রেখা বলতে দিবসের শুভ্রতা এবং কালো রেখা বলতে রাতের অন্ধকারকে বুঝানো হয়েছে বলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বর্ণনা করেছেন।[৪৬]

গ. কখনো কখনো কাজের মাধ্যমে তিনি দেখিয়ে দিতেন। যেমন, নামাযের সময় সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি নামায পড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।[৪৭]

ঘ. রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এমন আহকাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা, যা কুরআনে ছিলনা, অত:পর জিজ্ঞাসার জবাবে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) তা বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।[৪৮]

ঙ. কোন জিজ্ঞাসার জবাব ওহীর দ্বারা বর্ণনা করা, যদিও তা কুরআন নয়, যেমন সুগন্ধি মাখা জুব্বা পড়ে ইহ্রামকারী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে ওহী আসল যে, উক্ত জুব্বা খুলে সুগন্ধির চিহ্ন ধুয়ে ফেলতে হবে।[৪৯]

চ. কোন প্রশ্ন ছাড়াই নিজ থেকেই কোন সুন্নাহ্র দ্বারা আহকামের বর্ণনা করা। যেমন গাধার গোশত হারাম করা, মুত্'আ বিবাহ এবং স্ত্রীর সাথে তার ফুফু ও খালাকে বিবাহ হারাম করে দেয়া ইত্যাদি।[৫০]

ছ. উম্মাহর জন্য কোন কাজের বৈধতা বর্ণনার জন্য নিজে সে কাজ করে দেখানো।[৫১]

জ. কোন কাজ উম্মাহ করেছে, তা দেখে বা জেনে তার বৈধতার স্বীকৃতি দেয়া।[৫২]

ঝ. কোন বস্তুকে হারাম করা থেকে নিশ্চুপ থেকে তা বৈধ হওয়ার অবকাশ দেয়া, যদিও কথার মাধ্যমে তার অনুমতি দেয়া না হোক।[৫৩]

ঞ. কুরআন কোন বিষয় ওয়াজিব, হারাম বা বৈধ হওয়ার হুকুম দিয়েছে। কিন্তু সে হুকুমের

---

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২।
৪৭. প্রাগুক্ত.পৃ. ৩২৩।
৪৮. প্রাগুক্ত।
৪৯. প্রাগুক্ত।
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।
৫১. প্রাগুক্ত।
৫২. প্রাগুক্ত।
৫৩. প্রাগুক্ত।

শর্ত, প্রতিবন্ধকতা, সীমাবদ্ধতা, নির্দিষ্টদ্ধতা, নির্দিষ্ট সময়, অবস্থা ও গুণাবলীর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করতে হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তাঁর সুন্নাহর মাধামে। যেমন কুরআনে কোন্ কোন্ রমণীকে বিবাহ করা যাবেনা, তার বর্ণনা দেয়ার পর বলা হয়েছে, وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ "এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নারীদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো।" (৪, সূরা আন্ নিসা : ২৪) কিন্তু এ বৈধতা নির্ভর করে বিবাহের শর্ত পূরণ করা, প্রতিবন্ধকতাসমূহ না থাকা, সময় হওয়া এবং পাত্রের যোগ্যতার উপর। সুন্নাহর দ্বারা এগুলোর কর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা কুরআনের হুকুমের উল্লেখিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এগুলো কুরআনের পরিপূরক, কুরআনকে রহিতকারী নয়।' আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

"আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য দু'জন নারীর সমান অংশ হবে।" (৪, সূরা আন্ নিসা : ১১) এর পর সুন্নাহতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সন্তান যদি হত্যাকারী, কাফির বা ক্রীতদাস হয়, তাহলে উত্তরাধিকারী হবে না। এখানে কুরআন উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য সন্তান হওয়াকে আবশ্যক করেছেন। কিন্তু সুন্নাহতে সন্তান হওয়া ছাড়াও অরো কিছু গুণের সংযোজন করা হয়েছে। আর তা হলো দ্বীন এক হওয়া, ক্রীতদাস বা হত্যাকারী না হওয়া।[৫৪]

৫. যারা কুরআনের চেয়ে অতিরিক্ত হুকুম বর্ণনাকারী সুন্নাহকে গ্রহণ করার বিরোধী এবং এটি কুরআনকে রহিতকারী বলে বর্ণনা করেন, তাদের এ বর্ণনাকে ইবনুল কায়্যিম নিজেদের তৈরী পরিভাষা হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, এর দ্বারা নসের হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন এটাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) কোথায় নস্খ (রহিতকরণ) বলে উল্লেখ করেছেন? রাসূল (সা.) কোথায় বলেছেন, যখন আমার কোন হাদীছ আল্লাহর কিতাবের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু বর্ণনা করে তা প্রত্যাখ্যান কর, তা গ্রহণ করোনা, কারণ তা কিতাবুল্লাহর রহিতকারী? কোথায় আল্লাহ একথা বলেছেন যে, আমার রাসূল কুরআনের অতিরিক্ত কোন কথা বললে, তা গ্রহণ করোনা, তার প্রতি 'আমল করোনা, বরং প্রত্যাখ্যান কর?[৫৫]

৬. সুন্নাহর দ্বারা কুরআনকে খাস (বিশেষায়িত) করা জায়িয । যেমন: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ "এদদ্ব্যতীত অন্যান্য নারীদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো।"

এ আয়াতকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীছ

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

"কোন নারীকে তার ফুফু এবং খালার উপর বিবাহ করা যাবে না"[৫৬] দ্বারা খাস বা বিশেষায়িত করার ব্যাপারে উম্মাহ ঐক্যমত পোষণ করেছে।

তেমনিভাবে وَالسارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْ عُوا أَيْدِيَهُمَا "আর চোর পুরুষ হোক বা নারী, তাদের হাত কেটে দাও।" (৫, সূরা আল্ মায়িদা : ৩৮) এ আয়াতের সাধারণ হুকুমকে لَا قَ ْعَ فِي

---

৫৪. প্রাগুক্ত।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫।

৫৬. মুসলিম, কিতাবুন্ নিকাহ, বাবু তাহরীমিল জাম্ই বায়নাল মারআতি ওয়া 'আম্মাতিহা আও খালাতিহা ফিন্ নিকাহ। হাদীছ নং ১৪০৮ (৩০)

ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ "ফল বা খেজুর গাছের মজ্জা চুরি করলে তাতে হাত কাটা যাবে না"[৫৭] এ হাদীছ দ্বারা খাস বা বিশেষায়িত করার ব্যাপারে সকলেই একমত।[৫৮] এ প্রসংগে ইবনুল কায়্যিম বলেন

فاذا جاز التخصيص وهو رفع بعض ما تناوله اللفظ وهو نقصان من معناه فلأن تجوز الزيادة التى لا تتضمن رفع شئ من مدلوله ولا نقصانه بـ ريق الاولى والاحرى.

"কুরআনের শব্দে রয়েছে এমন কিছু প্রত্যাহার করে যখন বিশেষায়িত করা জায়িয, যা তার অর্থের হ্রাস ঘটানোর শামিল, তখন তাতে এমন বৃদ্ধি ঘটানো যার দ্বারা কোন কিছু প্রত্যাহার বা হ্রাস ঘটানো হয় না, তাতো বৈধ হওয়ার আরো অধিক উপযোগী।"[৫৯]

৭. অতিরিক্ত কিছুর দ্বারা যাতে বৃদ্ধি ঘটানো হয়, তার কোন কিছু প্রত্যাহার করা আবশ্যক হয় না। কোন ব্যক্তি যদি ধন-সম্পদ, জ্ঞান, সন্তানাদি প্রভৃতি বৃদ্ধি করে তাহলে কোন বিবেকবান ব্যক্তি এ কথা বলবে না যে, এ বৃদ্ধি দ্বারা তার ঝুলি থেকে কোন কিছু চলে গেছে। বরং বৃদ্ধির দ্বারা অতিরিক্ত হুকুম সাব্যস্ত হয় এবং সুস্পষ্টতা ও তাকিদ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এটা কারো জ্ঞান, ঈমান বা হিদায়াত বৃদ্ধির অনুরূপ।[৬০]

মোট কথা ইসলামী শরী'আর হুকুমসমূহ যেমন কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত হয়, তেমনিভাবে তা সুন্নাহ দ্বারাও সাব্যস্ত হয়। কুরআনে বর্ণিত হুকুমের অতিরিক্ত কোন হুকুম সুন্নাহর দ্বারা সাব্যস্ত হলে, তা কুরআনের রহিতকরণ নয়, বরং সম্পূরক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্য করার সাথে সাথে স্বীয় রাসূলের (সা.) আনুগত্য করারও নির্দেশ দিয়েছেন। সুন্নাহর অনুসরণ করার অর্থই হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর হুকুমের বাস্তবায়ন করা। সুতরাং সুন্নাহ একটি স্বতন্ত্র দলীল, যা কখনো কুরআনের ব্যাখ্যা পেশ করে, আবার কখনো স্বতন্ত্র হুকম জারী করে। এ স্বতন্ত্র হুকুমও উম্মাহর জন্য হুজ্জত বা প্রমাণ, যার প্রতি 'আমল করা ওয়াজিব। (চলবে)

* 'ইবনুল কায়্যিম : জীবন, চিন্তাধারা ও সংস্কারসমূহ' বই থেকে সংকলিত ও সম্পাদিত।

---

৫৭. তিরমিযী, আবওয়াবুল হুদুদ, বাবু মা জাআ লা-কাত্'আ ফী ছামারিন ওয়ালা কাছার, হাদীছ নং ১৪৪৯।
৫৮. ইবনুল কায়্যিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮।
৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮।
৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯।

চিন্তাধারা

রাগ না করার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

ডাঃ মোঃ তৌহিদ হোসাইন

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের উপর রাগের প্রভাবঃ

রাগের কারণে হাত-পা-মুখ-চোখ এবং শরীরের মাংশপেশীর কার্যকারিতা বাড়াতে গিয়ে রক্তের প্রবাহ ও মেটাবলিজমও বেড়ে যায়। একই সাথে রক্তের প্রবাহ অন্যান্য ভাইটাল অর্গান যেমন ব্রেইন, খাদ্যনালী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অর্গানগুলোতে কমে যায়। ফলে আমরা দেখতে পাই যে রাগান্বিত মানুষের মুখ শুকিয়ে যায়। খাদ্য নালীতে রক্তপ্রবাহ কমে যাওয়ার কারণে মেটাবলিজম এবং হজমে ব্যঘাত ঘটে। রাগ পাকস্থলীর গাত্রে এসিড সিক্রেশন বাড়িয়ে দেয়। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে নিগেটিভ আবেগ তথা রাগ, ভয় এবং উদ্বিগ্নতার কারণে প্রদাহজনিত অন্ত্রের রোগ (আইবিডি), ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম (আইবিএস), গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (জিইআরডি), এবং পেপটিক আলসার সহ সব ধরণেত পরিপাক সম্পর্কিত উপসর্গ বেড়ে যায়।

ইমিউন সিস্টেমের উপর রাগের প্রভাব

ক্রমাগত রাগ মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। কারণ অব্যাহত রাগ ন্যাচারাল কিলার সেল সংখা কমিয়েদেয়, ফলে ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলের সংখা বাড়িয়ে দেয়। ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলের সংখা বেড়ে যাবার কারণে আবার ক্যান্সারের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।

চোখ-মুখ-গলায় রাগের প্রভাবঃ একই কারণে রাগান্বিত মানুষের চোখের ভিতরকার চাপ বেড়ে যায় এবং চোখ-মুখ লাল হয়ে যায় এবং ঝাঁপসা দেখে। খারাপ আবেগের কারণে মুখের অভিব্যক্তি বিকৃত হয়ে যায় মুখের মাংসপেশীর অস্বাভাবিক রিয়েকশনের কারণে। কণ্ঠস্বরও পরিবর্তিত হয়ে যায় জোড়ে চিৎকার-চেচামেচি করে কথা বলতে গিয়ে স্বরযন্ত্রে অতিরিক্ত চাপের কারণে।

হাত-পায়ে রক্ত প্রবাহ বেড়ে যাওয়ার কারণে মেটাবলিজম বেড়ে গিয়ে প্রচন্ড শক্তি অর্জিত হয় এবং মারামারি করতে উদ্যত হয়।

মানসিক ক্ষতিঃ

রাগ যখন মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন রাগ প্রবণতা, রাগ বাধ্যবাধকতা, মানসিক ব্যাধি, অপরাধ প্রবণতা, নিজের উপর অধিক কন্ট্রোল কিংবা কন্ট্রোলে দুর্বলতা ইত্যাদি ধরণের সমস্যা দেখা দিতে পারে (এন্ডারসন অ্যান্ড এট. আল, ১৯৯৬)।

এ ছাড়াও মতিভ্রম, অবাস্তব দৃশ্য দর্শণ অনুভূতি, ব্যক্তিত্ব সংকট এবং পরবর্তীতে আবেগের চরম বহিঃপ্রকাশ, তারপর এক পর্যায়ে গভীর অনুসূচনা।

ক্রোধান্বিত ব্যক্তি এমনকি রাগের মুহূর্তে ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি যাহাই সামনে পায় তাই দিয়ে আঘাত করে প্রতিপক্ষকে।

রাগান্বিত ব্যক্তি নিজকে কন্ট্রোল করার নামে মাদকাশক্তিতে আসক্ত হয়ে যেতে পারে।

পারিবারিক ক্ষতিঃ যে স্বামী বা স্ত্রী কথায় কথায় রাগ করে, সে পরিবারের সন্তান-সন্ততি, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই খুব অস্বাভাবিক পরিবেশে বসবাস করে। ফলে পরবর্তী বংশধারায় এর প্রভাব প্রতীয়মান হয়।

রাষ্ট্রীয়বা পদস্ত কোন কর্তা ব্যক্তি যদি বদরাগী হয়, তাহলে সে রাষ্ট্র বা অফিস কোনটাই স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হতে পারবে না। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, শুধু মাত্র রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তির রাগ এবং একগুয়েমির কারণে বহু রাষ্ট্র এবং সমাজ ইতিহাসের আস্তাকুরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

কেন রাগ নিয়ন্ত্রণ করবো?

প্রথমত, রাগের কারণে অপূরণীয় শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ক্ষতি সাধিত হয়। তাই মানুষ যতবার রাগ করে, ততবারই আসলে নিজের শরীরে বিষ প্রয়োগ করে। এ জন্য নিজেকে সার্বিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, পরিবারে ও সমাজে ভালবাসা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য রাগ নিয়ন্ত্রণ জরুরী।

দ্বিতীয়ত, রাগ করা মানে অন্যের ভুলের শাস্তি নিজের ঘাড়ে নিয়ে নেয়া। তাই অন্য কোন ব্যক্তির অপরাধের কারণে যে ক্রোধের সৃষ্টি হয়তা শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে ক্ষমা করে রাগ নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ। আল্লাহর ক্ষমা ও পুরস্কার পেতেও রাগ নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ। কেননা, এই পৃথিবীতে আল্লাহর শরীয়তের স্থায়ী নিয়ম হল, কোন মানুষ অন্য কোন মানুষের যে কোন ধরণের অপরাধ ক্ষমা করে দিলে আল্লাহও তারচেয়ে অনেক অনেক বেশী অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। যে রাগ দমন করতে যত বেশী কষ্ট, সে রাগ দমন করতে পারলে তত বেশী পুরস্কার। তবে ব্যক্তির যে অপরাধ বার বার সংশোধন প্রচেষ্টার পরেও সংঘটিত হতে থাকে এবং যে অপরাধ সমাজ, রাষ্ট্র এবং আদর্শের ক্ষতি করে সে অপরাধের কারণে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শাস্তি হওয়া উচিৎ।

তৃতীয়ত, ক্রোধ সংবরণ ও ক্ষমা প্রদর্শনকারীরা বিস্তৃত জান্নাতের উত্তরসূরীঃ

وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ

"আর তোমরা দৌড়ে অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমীনব্যাপী বিস্তৃত, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে" (৩ ঃ ১৩৩)

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

"যারা সুসময়েও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন" (৩ঃ১৩৪)।

উপরোক্ত প্রথম আয়াতে বিশাল জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যারা তার পথে দৌড়ে অগ্রসর হয়। তারপর বলা হয়েছে এই সমস্ত জান্নাতের উত্তরসূরী দৌড় প্রতিযোগীতার যৌগ্য অনুসারী তারাই যারা আর্থিক অবস্থা যাই থাকুক সর্বাবস্থায় ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে মানুষকে ক্ষমা করে দেয়।

চতুর্থত, রাগ নিয়ন্ত্রণ আত্মসংযম ও ধৈর্যশীলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রাসূল (সা.) সারা জীবনই রাগ নিয়ন্ত্রণ করে আত্মসংযম ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, যখন তাঁকে অপমান, অপদস্থ ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল তখনও। রাগের অভিব্যক্তি প্রকাশ ও এর নিয়ন্ত্রণে তিনি উত্তম আদর্শ রেখে গেছেন। রাসূল (সাঃ) কখনো রাগ করলে

সাহাবাগণ তাঁর মুখের ভাষার ধরণ ও অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে পারেতেন যে তিনি রাগ করেছেন। অন্যথায় রাসূল (সাঃ) এর রাগ বুঝার উপায় ছিলনা। রাগ নিয়ন্ত্রণ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। যে ব্যক্তি রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, সে আধ্যাত্মিকভাবে এবং জাগতিকভাবেও পুরস্কৃত হয়। নবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ চরিতার্থ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা সংবরণ করে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং জান্নাতের যেকোনো হুর নিজের ইচ্ছামতো বেছে নেওয়ার অধিকার দান করবেন।' (ইবনে মাজাহ: ৪১৮৬)। রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বান্দার ক্রোধ সংবরণে যে মহান প্রতিদান রয়েছে, তা অন্য কিছুতে নেই।' (ইবনে মাজাহ: ৪১৮৯)।

পঞ্চমত, রাগ নিয়ন্ত্রণ হল মানুষের প্রাথমিক এবং প্রায়োরিটি ভিত্তিক একটি অত্যাবশ্যকীয়কাজ।

এক ব্যক্তি নবী (সা.)-কে বললেন, 'আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন, "তুমি রাগ করো না"। ওই ব্যক্তি কয়েকবার তা বললেন। নবী (সা.) প্রতিবারই বললেন, "রাগ করো না"।' (বুখারি, খণ্ড: ৮, অধ্যায়: ৭৩, হাদিস: ১৩৭)।

ষষ্ঠত, হৃদরোগী ও অন্যান্য শারীরিক রোগে আক্রান্ত রোগী, যারা দায়িত্বশীল জায়গায় অবস্থান করছেন এবং যারা ক্ষমতাশালী তাদের উচিৎ সব সময়রাগ নিয়ন্ত্রণে রেখে কাজ করা। কারণ তাদের নিয়ন্ত্রণহীন রাগের কারণে নিজের বা সমাজের অপূরণীয়ক্ষতি সাধিত হতে পারে।

সপ্তমত, রাগ নিয়ন্ত্রণ স্বভাব বা প্রকৃতির ধর্ম। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রকৃতির বৈরি আচরণ (প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়, ঝড়-ঝলোচ্ছাস, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি) স্থায়ী এবং সর্বাত্মক ধবংসকারী নয়। এক পর্যায়ে থেমে গেলে মানুষ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগ পায়। তেমনি মানুষেরও উচিৎ রাগকে নিজের মধ্যে স্থায়ীভাবে বাসা বাধতে না দেয়া।

অষ্টমত, মানুষ যতক্ষণ রাগান্বিত থাকে ততক্ষণ স্বাভাবিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা বৈজ্ঞানিক কারণেই সম্ভব নহে। রাগ ধরে রেখে এবং ক্ষমা না করে আপনি এগিয়ে যেতে পারবেন না। রাগ জারি রেখে কোন ব্যাপারে সঠিক সিদ্বান্ত নেয়া অসম্ভব। এ জন্যই স্বাভাবিক জীবন লাভ করে ধন্য হওয়া এবং স্বাভাবিক কাজ-কর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য রাগ নিয়ন্ত্রণ জরুরী।

নবমত, রাগের ওসওয়াসা সৃষ্টিকারী হল আমাদের চিরশত্রু শয়তান ও তার দল-বল। আমাদের উচিৎ হবেনা শয়তানের মানব সমাজ বিধবংসী উস্কানিতে পা দেয়া। আল্লাহ বলেন,

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ نَزۡغٞ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ" (আরাফ-২০০)।

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ إِذَا مَسَّهُمۡ طَٰٓئِفٞ مِّنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبۡصِرُونَ

"নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে যখন তাদেরকে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায়" (আরাফ-২০১)

وَإِخۡوَٰنُهُمۡ يَمُدُّونَهُمۡ فِي ٱلۡغَيِّ ثُمَّ لَا يُقۡصِرُونَ

"আর শয়তানের ভাইয়েরা ভ্রষ্টতায় তাদেরকে সহযোগিতা করে। অতঃপর তারা ত্রুটি করে না"- (আরাফ-২০২)।

দশমত, রাগ নিয়ন্ত্রণ করলে মানুষের হৃদয়ও মন প্রশস্থ হয়। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, যে মানুষ রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে জানে, আল্লাহতায়ালা তার হৃদয় ঈমান ও শান্তি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেন।

রাগ দমনের উপায়ঃ

গবেষণায় দেখা গেছে শরীর চর্চায় রাগ কমানোর পাশাপাশি মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। ব্যায়াম করলে রক্তচাপ কমে যায় এবং রক্ত প্রবাহে এন্ডোরফিন নিঃসৃত হয় যা তৃপ্তির অনুভূতি বাঙায়।

প্রথমত, ক্রোধের উদ্রেক হলে আল্লাহকে স্মরণ করাঃ

ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার প্ররোচনা। কাজেই এ রকম কিছু অনুভব হলে বান্দার উচিৎ সাথে সাথে আল্লাহর কথা স্মরণ করা এবং 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাযিম' পাঠ করা।

নিঃসন্দেহে অভিশপ্ত শয়তানই মানুষের অন্তরে ক্রোধের আগুন প্রজ্বলিত করে। কাজেই ক্রোধের আগুন থেকে বাচার অন্যতম কার্যকর পন্থা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা; যাতে শয়তানের প্ররোচনা হতে নিরাপদ থাকা যায়।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, লা হাওলা ওয়ালা কুউওতা ইল্লা বিল্লাহে আল আলীউল আজীম' পাঠের মাধ্যমে ক্রোধ নির্বাপিত হয়।

সুলাইমান ইবনে সারদ রা. থেকে বর্ণিত, দুই ব্যক্তি পরস্পর গালাগাল করছিল। তাদের একজনের চোখ লাল হয়েউঠল ও গলার শিরা ফুলে গেল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি একটি বাক্য জানি, যদি সে তা পড়ে তাহলে তার এ অবস্থা কেটে যাবে। সে বাক্যটি হলো, আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম (আমি আল্লাহর কাছেঅভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয়প্রার্থনা করছি।') (বুখারী: ৩১০৮, মুসলিম: ৬৮১২)

দ্বিতীয়ত, শারিরীক অবস্থার পরিবর্তনঃ

শারীরিক অবস্থান পরিবর্তনের বিভিন্ন ধরণ হতে পারে। যেমন কেউ দাঁড়িয়ে রাগ করলে বসে পড়া, বসে রাগ করলে শুয়ে পড়া ইত্যাদি। রাসূল (সাঃ) রাগান্বিত ব্যক্তিকে রাগ দমনের জন্য শারিরীক অবস্থা পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু যর গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যখন তোমাদের কারো রাগ হয় তখন সে যদি দাঁড়ানো থাকে, তবে যেন বসে পড়ে। যদি তাতে রাগ চলে যায় ভালো। আর যদি না যায়, তবে সে যেন শুয়ে পড়ে।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৪৭৮৪)

তৃতীয়ত, সিজদায় পড়ে যাওয়াঃ

রাগ ও ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার অন্যতম উপায় হচ্ছে মানুষ যখন রাগান্বিত হয়, তখন তার উচিত সিজদাবনত হওয়া। কেননা সিজদা ক্রোধের আগুনকে নিভিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে রাসূলের (সা.) উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন: ক্রোধ হচ্ছে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় যা মানুষের মন ও মানসিকতার উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ অবস্থাতে দেখবে যে, ক্রোধান্বিত ব্যক্তির চোখ রক্ত বর্ণ হয়ে যায়। কাজেই যদি কারও মধ্যে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে তার উচিত সেজদাবনত হওয়া। নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি ক্রোধান্বিত অবস্থায় সেজদাবনত হবে, আল্লাহ তাকে শয়তানের প্রজ্বলিত আগুন থেকে রক্ষা করবেন এবং তার অন্তরে প্রশান্তির সৃষ্টি হবে।

চতুর্থত, নিজের মুখের ভাষার পরিবর্তন অর্থাৎ রাগ হলে চুপ হয়ে যাওয়া

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) বর্ণনা করেন, নবীজি (সা.) আমাদের আরও উপদেশ দিয়েছেন, 'যদি তোমাদের কেউ রাগান্বিত হয়ে পড়ে, তবে তাকে নীরব থাকতে দাও।'

রাগের সময় চুপ থাকার কথাটি প্রিয়নবি ৩ বার বলেছেন। চুপ থাকলে রাগ দমন হয়। রাগের ক্ষতি থেকে বাঁচা যায়।

রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা শিক্ষা দাও এবং সহজ করো। কঠিন কোরো না। যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো; যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো; যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো।' (মুসনাদে আহমাদ)

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন, এটাও (চুপ থাকা) রাগ সংবরণের অন্যতম কার্যকরী উপায়। রাগের সময়মানুষ অনেক অনুচিত কথা বলে ফেলে যার ফলে সে পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয় নানা অনিষ্টতার শিকার হয়। যদি সে রাগের সময়চুপ থাকে, তাহলে সে বহু অনিষ্টতা থেকে বেঁচে যাবে। (জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম: ১/ ১৪৬)

পঞ্চমত, ক্ষমা করে দেয়াঃ

আসলে কারো প্রতি কোন কারণে রাগান্বিত হলে তাকে ক্ষমা না করা পর্যন্ত কোন রাগান্বিত ব্যক্তিই স্বাভাবিক কাজ-কর্ম চালাতে পারে না। ক্ষমা করে দেয়ার মাধ্যমেই তার মনে প্রশান্তি আসতে পারে। জীবনের এক কঠিনতম সময়ে আমাদের প্রিয় নবীজি (সা.) তায়েফে গিয়েছিলেন, আশা করেছিলেন তায়েফবাসী তাঁর কথা শুনবে, তাঁকে সহযোগিতা করবে। কিন্তু সহযোগিতার পরিবর্তে তিনি পেলেন অপমান। তাঁর শরীর থেকে রক্ত গড়িয়ে পায়ে গিয়ে জমাট বাঁধল। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে একজন ফেরেশতা এলেন। ফেরেশতা তায়েফের দুপাশের পাহাড় এক করে দিয়ে তায়েফবাসীকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু নবী (সা.)-এর উত্তর ছিল, ' (না, তা হতে পারে না) বরং আমি আশা করি মহান আল্লাহ তাদের বংশে এমন সন্তান দেবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে শরিক করবে না।' (বুখারি, খণ্ড: ৪, অধ্যায়: ৫৪, হাদিস: ৪৫৪)।

ষষ্ঠত, কাজের পরিবর্তন বা স্থান ত্যাগ করাঃ

কাজের পরিবর্তনের মধ্যে অন্যতম হল, রাগ হলে ওজু করা, দ্রুতই অন্য কোন কাজে মনোনিবেশ করা কিংবা গোসল করা।

রাসুল (সাঃ) বলেছেন, রাগ আসে শয়তানের পক্ষ থেকে; শয়তানকে তৈরি করা হয়েছে আগুন থেকে, আর একমাত্র পানির মাধ্যমেই আগুন নেভানো সম্ভব। তাই তোমাদের মধ্যে কেউ যখন রাগান্বিত হয়ে পড়ে, তার উচিত অজু করা।' (আবু দাউদ)।

সপ্তমত, ক্রোধ সংবরবণ বীরত্বের পরিচায়কঃ

বিবেককে জাগ্রত করে নিজকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ।

রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'সে প্রকৃত বীর নয়যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়; বরং সে-ই প্রকৃত বীর যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।' (বুখারি)

অষ্টমত, রাগ দমনকারী আল্লাহর মোহসীন বান্দাহঃ

যেহেতু রাগ দমন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সেহেতু যে কেউ যে কোন অবস্থায় রাগ দমন করার মত গুণাবলী অর্জন করে সে আল্লাহর কোরআনের ঘোষণামতে মোহসীন বান্দাহ।

রাগ দমনকারীদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন,

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

"যারা সুসময়েও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ মোহসীনদের ভালবাসেন" (আল-ইমরান-১৩৪)

রাগ দমনের পুরস্কারঃ

হযরত আলী (রাঃ) এর একটি বিখ্যাপ্ত উক্তি হল, "পূন্য অর্জনের চেয়ে পাপ থেকে বিরত থাকা শ্রেয়তর"।

রাগ একটি পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার সহজ সরল পথ। এ জন্য ইসলাম রাগ দমনের নির্দেশ দানের পাশাপাশি রাগ দমনকারীর জন্য বহু পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করেছে।

প্রথমত, রাগ দমনে আল্লাহর ভালবাসা অর্জিত হয়

দ্বিতীয়ত, রাগ দমনে জান্নাতের রাস্তা সহজ হয়ে যায়ঃ

হযরত আবু দারদা রা. একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়েযাবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি রাগ করবে না, তাহলে তোমার জন্য জান্নাত। (তবারানী: ২৩৫৩)

তৃতীয়ত, পরকালে বিশেষ পুরস্কার

হাশরের মাঠে সকলের সামনে বিশেষ সম্মান দান। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজের রাগকে সংবরণ করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামত দিবসে সকল মাখলুকের সামনে ডেকে এনে সে যে হুরকে চায় তাকে নিয়ে নেওয়ার ইচ্ছাধিকার দান করবেন। (আবু দাউদ: ৪৭৭৭, তিরমিযি : ২৪৯৩)

চতুর্থত, মানুষকে ক্রোধ থেকে মুক্তি দিলে আল্লাহও বান্দাকে তার ক্রোধ থেকে মুক্তি দিবেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বলললাম, হে আল্লাহর রসূল! কোন জিনিস আমাকে আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে পারে? তিনি বললেন, তুমি রাগ করো না। (সহীহ ইবনে হিব্বান: ২৯৬) অর্থাৎ, তুমি রাগ করা থেকে বিরত থাকলে আল্লাহর ক্রোধ থেকে রেহাই পাবে।

পঞ্চমত, রাগ দমনে মানুষের ঈমান বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার নিকট হজম করার জিনিসের মধ্যে সর্বোত্তম হলো, কোনো ব্যক্তির তার রাগকে হজম করে নেওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য তার রাগকে হজম করে নিল, আল্লাহ তাকে ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন।

(মুসনাদে আহমদ : ১/ ৩২৭)

ষষ্ঠত, বিপুল সওয়াবের সুসংবাদ। ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়বান্দার রাগ হজম করে নেওয়া আল্লাহর নিকট বিশাল প্রতিদান লাভের মাধ্যম হয়। (মুসনাদে আহমদ: ২/১২৮)

সপ্তমত, রাগের কারণে সৃষ্ট নানান ধরণের শারীরিক রোগ ও মানসিক যাতনা থেকে রেহাই পাওয়া যায় রাগ দমনে।

সপ্তমত, স্বামী-স্ত্রী বা সংসারে-সমাজে শান্তি বিরাজমান থাকে। (সমাপ্ত) ■

ব্যবসায়িক মুনাফায় শ্রমিকের অংশীদারিত্ব

শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া

কোন কোম্পানি বা কারখানা বা ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার জন্য মৌলিকভাবে দুটি পক্ষ বিদ্যমান থাকে। এগুলো হলো যথাক্রমে:

ক. মালিক বা উদ্যোক্তা পক্ষ খ. শ্রমিক পক্ষ।

মালিক পক্ষ পরিকল্পনা করেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বিনিয়োগ করেন। অন্যদিকে শ্রমিকগণ শ্রম দেন। মালিক বা উদ্যোক্তাগণ যদি তাঁদের চিন্তা-চেতনা-পরিকল্পনা এবং অর্থের বিনিয়োগ না করেন তাহলে ব্যবসা বা শিল্পের সূচনা ঘটে না। পাশাপাশি শ্রমিকগণ যদি আন্তরিকভাবে তাঁদের নিরলস শ্রম দিতে কুণ্ঠিত হন তাহলে ঐ ব্যবসা বা শিল্পের প্রসার ঘটা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

মোদ্দা কথা, মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া কোন ব্যবসা বা শিল্পের অর্থবহ বিকাশ লাভ অসম্ভব। দুটি পক্ষ একে অপরের পরিপূরক। একটির অবর্তমানে অন্যটি পঙ্গু।

একজন মালিক ব্যবসায় মুনাফা ভোগ করেন। অন্যদিকে শ্রমিক পান মজুরী। শ্রমিকের বিনিদ্র রজনী যাপন, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, রোদ-বৃষ্টির ধকল, জীবনের ঝুঁকি-এসবের বিনিময়েই আসে মুনাফা। অর্থ বিনিয়োগকারী হিসেবে এ মুনাফার সিংহভাগেরই প্রাপ্য মালিক হলেও এর কিছু না কিছুর অংশের অংশীদার হবেন শ্রমিক। যুক্তি-নীতি-নৈতিকতা সব নিরিখেই এ কথা অনস্বীকার্য।

আমাদের দেশে রয়েছে প্রচুর মিল-ফ্যাক্টরী, ইন্ডাস্ট্রি ও ট্রেডিং হাউজ। এগুলোতে কাজ করেন ব্যাপক সংখ্যাক শ্রমিক। এসব শ্রমিক মাস শেষে একটি সামান্য মজুরী পান মাত্র। এ মজুরী দিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কোন স্তরেই কোন ভাবেই উৎকর্ষ সাধন হয় না। জীবন ধারণ ও সঞ্চালনের মৌলিক প্রয়োজনগুলোর দায় মেটাতে গিয়ে তাঁরা দারিদ্রের চরম কষাঘাতে হাবুডুবু খান। অনেকটাই যেন আত্মবিসর্জিত হন। অন্যদিকে শিল্পের মালিকেরা প্রাপ্য মুনাফা দিয়ে একদিকে পাহাড়সম বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হন এবং অন্যদিকে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলেন। এভাবে তাঁরা একটির পর একটি ইন্ডাস্ট্রি তথা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির মালিক বনে যান। ব্যবসায়িক মুনাফার ন্যায়পরায়ণ অংশীদারিত্ব থাকলে এ নৈরাজ্য ও বৈষম্য কিছুটা হলেও রোধ করা সম্ভব হতো।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ শ্রম আইনে কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

২৩২. প্রয়োগ। (১) কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশীদারিত্ব নিম্নলিখিত যে কোন একটি শর্ত পূরণ করে এমন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যথা:

(ক) কোন হিসেব বছরের শেষ দিনে উহার পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ অন্যুন এক কোটি টাকা;
(খ) কোন হিসেব বছরের শেষ দিনে উহার স্থায়ী সম্পদের মূল্য অন্যুন দুই কোটি টাকা;
(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহাতে উল্লিখিত অন্য কোন কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ করতে পারবেন।
(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, শতভাগ রপ্তানীমূখী শিল্প সেক্টর অথবা শতভাগ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগকারী শিল্প সেক্টরের ক্ষেত্রে সরকার, বিধি দ্বারা, উক্ত সেক্টরে কর্মরত সুবিধাভোগীদের জন্য ক্রেতা ও মালিকের সমন্বয়ে সেক্টর ভিত্তিক কেন্দ্রীয়ভাবে একটি করে তহবিল গঠন, তহবিল পরিচালনা বোর্ড গঠন, অনুদানের পরিমাণ নির্ধারণ ও আদায়ের পদ্ধতি এবং তহবিলের অর্থের ব্যবহারের বিধানসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করবে;
তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে উক্ত বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

২৩৪. অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল স্থাপন

(১) এই অধ্যায় প্রযোজ্য হয় এরূপ প্রত্যেক কোম্পানি-
(ক) এই অধ্যায় প্রযোজ্য হবার তারিখ হতে এক মাসের মধ্যে এই অধ্যায়ের বিধান মোতাবেক একটি শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল ও একটি শ্রমিক কল্যাণ তহবিল স্থাপন করবে; এবং
(খ) এর মালিক প্রত্যক বছর শেষ হবার অন্যুন নয় মাসের মধ্যে, পূর্ববর্তী বছরের নীট মুনাফার পাঁচ শতাংশ (৫%) অর্থ ৮০:১০:১০ অনুপাতে যথাক্রমে অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদান করবে;
তবে শর্ত থাকে যে, কোন মালিক এই বিধান কার্যকর হবার অব্যবহিত পূর্বে, কোম্পানির নীট মুনাফার এক শতাংশ (১%) অর্থ কল্যাণ তহবিলে জমা প্রদান করে থাকলে, ট্রাস্টি বোর্ড কল্যাণ তহবিলে জমাকৃত উক্ত অর্থের পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) অর্থ উপরোল্লিখিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।
(২) উপ-ধারা (১) (খ) এর অধীন উক্ত তহবিলসমূহে প্রদত্ত অর্থ যে বছরের জন্য প্রদান করা হবে সে বছরের শেষ হবার অব্যবহিত পরের বছরের পহেলা তারিখে উহা তহবিলসমূহে বরাদ্দ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

২৩৫. তহবিলদ্বয়ের ব্যবস্থাপনা

(১) অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল স্থাপিত হবার পর যথাশিঘ্র সম্ভব নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হবে, যথা:
(ক) কোম্পানির যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য এবং এইরূপ কোন প্রতিনিধি না থাকলে, কোম্পানির শ্রমিকগণ কর্তৃক তাঁদের নিজেদের মধ্য হতে নির্বাচিত দুইজন সদস্য, এবং
(খ) কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য, যাদের মধ্যে অন্তত একজন হবেন কোম্পানির হিসাব শাখা হতে মনোনীত ব্যক্তি।

(২) ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যগণ পালাক্রমে উপ-ধারা (১) (ক) ও (১) (খ) এর অধীনে সদস্যগণের মধ্য হতে প্রত্যেক বছরের জন্য উহার একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন, তবে প্রথম চেয়ারম্যান উপ-ধারা (১) (খ) এর অধীন সদস্যগণের মধ্য হতে হবে।

(৩) এই অধ্যায় এবং এতদউদ্দেশ্যে প্রনীত বিধির বিধান অনুযায়ী ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলদ্বয়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করবে।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ড উহার ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সরকার কর্তৃক সময় প্রদত্ত নির্দেশের অধীন থাকবে।

(৫) সরকার যদি এই মত পোষণ করে যে, ট্রাস্টি বোর্ড বা উহার কোন সদস্য দায়িত্ব পালনে পুন:পুন: ব্যর্থ হচ্ছে অথবা সাধারণত তহবিলদ্বয়ের লক্ষ্য ও স্বার্থের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ভাবে কাজকর্ম করছে তা হলে সরকার, বোর্ড বা সদস্যটিকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দান করে, আদেশ দ্বারা-

(ক) উহাতে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বোর্ড বাতিল করতে পারবে, অথবা সদস্যটিকে তার পদ হতে অপসারণ করতে পারবে: এবং

(খ) ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বা উক্ত সদস্যের পদে নতুন সদস্য মনোনীত বা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত বোর্ডের বা উক্ত সদস্যের ক্ষমতা ও দায়িত্ব, আদেশে উল্লিখিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রয়োগ ও পালনের জন্য নির্দেশ দিতে পারবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন ট্রাস্টি বার্ড বাতিল হবার পর, উহার সদস্যগণ তাঁদের পদে আর বহাল থাকবেন না এবং এই অধ্যায়ের কোন বিধিতে ট্রাস্টি বোর্ডের উল্লেখ থাকলে উহা উক্ত উপ ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশে উল্লিখিত ব্যক্তিকে বুঝাবে।

(৭) বাতিলের মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই এই অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠিত হবে যাতে ইহা উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পরে উহার কার্যভার গ্রহণ করতে পারবে।

(৮) উপ-ধারা (৫) এর দফা (ক) এর অধীন সরকার কর্তৃক কোন ট্রাস্টি বোর্ড বাতিল করা হলে অথবা উহার চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে অপসারণ করা হলে উক্ত বোর্ডের সদস্যবৃন্দ অথবা উহার চেয়ারম্যান বা সংশ্লিষ্ট সদস্য ট্রাস্টি বোর্ডে পুন:নির্বাচিত বা মনোনীত হতে পারবেন না।

২৩৬. জরিমানা, অর্থ আদায়, ইত্যাদি

(১) যে ক্ষেত্রে কোন কোম্পানি বা ট্রাস্টি ধারা ২৩৪ এর বিধানসমূহ প্রতিপালন করতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে সরকার, আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

(২) যদি কোন কোম্পানি বা ট্রাস্টি বোর্ড উপ-ধারা (১) এর অধীর প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হয় তা হলে সরকার আদেশ দ্বারা, উক্ত কোম্পানির প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক অথবা উহার ব্যবস্থাপনা কাজের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অথবা, ক্ষেত্রমতে, সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান, সদস্য বা উহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে অনধিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা এবং অব্যাহত ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, ব্যর্থতার প্রথম তারিখের পর হতে প্রত্যক দিনের জন্য আরও ০৫ (পাঁচ) হাজার টাকা করে জরিমানা আরোপ করে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জরিমানার মোট অর্থ প্রদান করতে পারবে;

তবে, শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি উল্লিখিত বিধান পুনরায় লঙ্ঘন করলে বা প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে দ্বিগুণ জরিমানা আরোপিত হবে।

(৩) ধারা ২৩৪ এর অধীন প্রদেয় কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকলে এবং এ ধারার অধীন আরোপিত জরিমানা, সংশ্লিষ্ট আদেশে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা না হলে, উক্ত অপরিশোধিত অর্থ ও জরিমানা সরকারি দাবী হিসেবে গণ্য হবে এবং উহা Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. IX of 1913) এর বিধান অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন কোন আদেশের দ্বারা সংক্ষুদ্ধ কোন ব্যক্তি উহা পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের নিকট, উক্ত আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, দরখাস্ত পেশ করতে পারবেন এবং উক্তরূপ দরখাস্ত প্রাপ্তির পর সরকার অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করত: যথাযথ আদেশ প্রদান করবে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, কোম্পানি বা ট্রাস্টি বোর্ডকে অবহিত করবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ অধীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলে হণ্য হবে।

২৪০. অংশগ্রহণ তহবিলের বিনিয়োগ

(১) অংশগ্রহণ তহবিলে বরাদ্দকৃত অথবা জমাকৃত সকল অর্থ কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনার কাজে লাগাতে পারা যাবে।

(২) কোম্পানি ট্রাস্টি বোর্ডকে অংশগ্রহণ তহবিলের অর্থ উপ-ধারা (১১) এর অধীন বিনিয়োগের কাজে ব্যবহার করবার জন্য অনুরোধ করতে পারবে এবং বোর্ড উক্তরূপ বিনিয়োগ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

(৩) কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনা কাজে নিয়োজিত অংশগ্রহণ তহবিলের কোন অর্থের উপর, কোম্পানি ব্যাংক হারের আড়াই শতাংশ অধিক হারে অথবা উহার সাধারণ শেয়ারের জন্য ঘোষিত মুনাফার হারের পঁচাত্তর শতাংশ হারে, যাহা অধিক হবে, সুদ প্রদান করবে।

(৪) যতি কোন কোম্পানির একাধিক শ্রেণীর সাধারণ শেয়ার থাকে, এবং উহার জন্য বিভিন্ন হারে মুনাফা ঘোষিত হয় তা হলে, উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদয় সুদের হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উক্ত ঘোষিত বিভিন্ন মুনাফার হারের গুরুত্বানুযায়ী হিসেবকৃত গড়কে গ্রহণ করতে হবে।

(৫) অংশগ্রহণ তহবিলে প্রদেয় উক্তরূপ সুদ, তহবিলের অর্থ কোম্পানি যে বছরে ব্যবহার করেছে, সে বছরের অব্যবহিত পরবর্তী বছরের প্রথম তারিখ হতে তহবিলে জমা হবে।

(৬) যে ক্ষেত্রে কোন কোম্পানি উপ-ধারা (১) এ অধীন অংশগ্রহণ তহবিলের কোন অর্থ নিজের ব্যবসার কাজে লাগাতে ইচ্ছুক না হয় সে ক্ষেত্রেও, উক্ত তহবিলের টাকা বরাদ্দ হওয়ার তারিখ হতে উহা উপ-ধারা (১১) অনুযায়ী বিনিয়োগ না পর্যন্ত সময়ের জন্য তহবিলের উক্ত টাকার উপর উল্লিখিত হারে কোম্পানি কর্তৃক সুদ প্রদেয় হবে।

(৭) যদি অংশগ্রহণ তহবিল স্থাপিত হওয়ার পর কোন সময় কোম্পানি, বোনাস অথবা বোনাস শেয়ারের মাধ্যম ব্যতীত, অন্য কোনভাবে অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করে, তা হলে উপ-ধারা (১) এর অধিন কোম্পানির ব্যবহারযোগ্য কোন অর্থ অথবা অংশগ্রহণ তহবিলের কোন সম্পদ সাধারণ সম-মূলধনে পরিবর্তন করার প্রথম পছন্দ উক্ত তহবিলের থাকবে; তবে ইহা, উক্তরূপ পরিবর্তনের পূর্বে, কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের পঁচিশ শতাংশ অথবা অতিরিক্ত মূলধনের পঞ্চাশ শতাংশ, যা কম হবে, এর অধিক হবে না।

(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীন পরিবর্তনের অধিকার প্রয়োগের প্রয়োজনে, কোম্পানির অতিরিক্ত মূলধনে অংশগ্রহণ করবার জন্য অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে অংশগ্রহণ তহবিলের সম্পদ বিক্রি করবার জন্য ট্রাস্টি বোর্ডকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।

(৯) উপ-ধারা (৭) এ বর্ণিত পন্থায় সংগৃহীত শেয়ারে, অন্যান্য শেয়ারের মত একই পন্থায় ভবিষ্যত বোনাস এবং অধিকার ইস্যুতে অংশগ্রহণ করবে।

(১০) উপ-ধারা (৭) এ বর্ণিত পন্থায় সংগৃহীত শেয়ারের, অন্যান্য শেয়ারের মত একই পন্থায়, ভোটের অধিকার থাকবে এবং উক্তরূপ ভোটের অধিকার অংশগ্রহণ তহবিলের পক্ষে ট্রাস্টি বোর্ড প্রয়োগ করবে।

(১১) অংশগ্রহণ তহবিলের অর্থ সরকারি মালিকানাধীন বিনিয়োগযোগ্য কোন খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

২৪১. সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা।

(১) সকল সুবিধাভোগী এ অধ্যায়ের অধীন সকল সুবিধা সমান অনুপাতে পাবার এবং তহবিলদ্বয়ে অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন।

(২) কোন হিসেব বছরে কোন সুবিধাভোগী কোন কোম্পানিতে অন্যুন ছয় মাস চাকুরী পূর্ণ না করলে তিনি উক্ত বছরের জন্য তহবিলদ্বয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

২৪২. অংশগ্রহণ তহবিলের ব্যবহার

(১) প্রত্যেক বছর অংশগ্রহণ তহবিলে জমাকৃত মোট অর্থের দুই-তৃতীয়াংশ সমান অনুপাতে সকল সুবিধাভোগীগণের মধ্যে নগদে বন্টন করা হবে, এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা ২৪০(১১) এর বিধান মোতাবেক বিনিয়োগ করা হবে, যার মুনাফাও সকল সুবিধাভোগীগণের মধ্যে সমান অনুপাতে বন্টন করা হবে।

(২) যদি কোন সুবিধাভোগী স্বেচ্ছায় কোম্পানির চাকুরী ত্যাগ করে চলে যান, তা হলে এ অধ্যায়ের অধীন তহবিলদ্বয় হতে তাকে কোন সুবিধা প্রদেয় হলে তা তিনি পাবেন।

(৩) কোন সুবিধাভোগীর চাকুরী, বরখাস্ত ব্যতীত, অন্য কোন ভাবে অবসান করা হলে, তিনি কোম্পানির চাকুরী হতে অবসরপ্রাপ্ত কোন সুবিধাভোগীর সমতুল্য হবেন।

(৪) কোন সুবিধাভোগী চাকুরী হতে বরখাস্ত হলে, তহবিলদ্বয়ে তার অংশ বাজেয়াপ্ত হবে।

(৫) যে ক্ষেত্রে কোন সুবিধাভোগী কোন কোম্পানির কোর অফিস বা ইউনিট হতে উহার অন্য কোন অফিস বা ইউনিটে বদলী হন, সে ক্ষেত্রে তার নামে জমাকৃত তহবিলদ্বয়ের সুবিধা উক্ত বদলীকৃত অফিসে বা ইউনিটের তহবিলদ্বয়ে স্থানান্তরিত হবে, এবং তার পূর্বের অফিস বা ইউনিটের চাকুরী তার বদলীকৃত অফিস বা ইউনিটের তহবিল হতে প্রদেয় সুযোগের ক্ষেত্রে গণনায় আনা হবে।

(৬) কোন সুবিধাভোগীর অবসর গ্রহণের পর তিনি, অথবা কোম্পানিতে চাকুরীরত থাকাকালে তার মৃত্যু ঘটলে তার মনোনীত স্বত্ত্বভোগী, এ অধ্যায়ের অধীন পূর্ণ সুবিধা ভোগ করবেন।

২৪৩. কল্যাণ তহবিলের ব্যবহার

কল্যাণ তহবিলে জমাকৃত অর্থ, এ অধ্যায়ের বিধানাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে, ট্রাস্টি বোর্ড যেভাবে স্থির করবে সেভাবে এবং সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে এবং বোর্ড তৎসম্পর্কে সরকারকে অবহিত করবেন।

শ্রমিককে ব্যবসার লভ্যাংশ (Workers' Profit Participation) এবং পণ্যের অংশীদারিত্ব প্রদানে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদের সার্বভৌমত্ব ও মালিকানা একমাত্র আল্লাহর, আর মানুষ তাঁর তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। সুতরাং, এখানে মালিক-শ্রমিক সবাই ভাই ভাই। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে শ্রদ্ধা-স্নেহ, সৌহার্দ ও বিশ্বস্ততরা অনুপম চেতনায় ভরপুর।

ইসলাম মালিক ও উদ্যোক্তার মেধা, শ্রম ও সামাজিক মর্যাদাকে অস্বীকার করেনি। চাপিয়ে দেয়নি নিপীড়নমূলক কোন ব্যবস্থা। বরং তাঁর ভেতর মানবিক মূল্যবোধ ও শ্রমিকের প্রতি মমতা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ তায়ালা জীবনোপকরণে তোমাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তারা তাদের অধীন দাস-দাসীদের নিজেদের জীবনোপকরণ থেকে এমন কিছু দেয় না যাতে তারা তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে?" (সুরা সাহল, আয়াত:৭১)

উল্লিখিত আয়াতে যেমন মালিকের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়েছে, তেমনি তার অহংবোধ ও শ্রেণি বৈষম্যের ধারণার নিন্দা করা হয়েছে। পাশাপাশি সম্পদের প্রকৃত মালিকানা ও তা অর্জন করতে পারা যে একান্তই আল্লাহর অনুগ্রহ সেটাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যেন তিনি মানবিক মূল্যবোধের জায়গা থেকে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণে মনোযোগী হন।

ইসলামী অর্থনীতি ও শ্রমনীতি অনুযায়ী শ্রমিক মজুরকে মূল ব্যবসায়ের মুনাফা এবং শিল্পপণ্যে অংশীদাররূপে স্বীকার করে । নবী করীম সা: এর একটি হাদীসে স্পষ্টভাবে এর নির্দেশনা পাওয়া যায়:

"তোমাদের কোন ভৃত্য যদি তোমাদের জন্য খাদ্য তৈরী করে নিয়ে আসে তখন তাঁকে হাতে ধরে নিজের সাথে বসাও, সে যদি বসতে অস্বীকার করে তবু দু-এক মুঠি খাদ্য অন্তত তাঁকে অবশ্যই খেতে দেবে। কারণ সে আগুনের উত্তাপ ও ধুম্র এবং খাদ্য প্রস্তুত করার কষ্ট সহ্য করেছে"। (তিরমিযী)

শ্রমিকের মর্যাদাপূর্ণ জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব মালিকেরই। রাসূল সা: বলেছেন, মালিকানাধীন (অধীন) ব্যাক্তির জন্য খাবার ও কাপড়ের অধিকার রয়েছে। মুসলিম, হাদিস: ১৬৬২)

শ্রমিকগণ দিন-মান খেটে, পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে কাজ করেন। তাঁর হাড়ভাঙ্গা শ্রম নিয়ে মালিক ব্যবসা পরিচালনা করেন এবং লাভবান হন। তাই রাসূল (সা.) বলেন,

'মজুর ও শ্রমিককে তাঁর শ্রমোৎপাদিত দ্রব্য থেকেও অংশ প্রদান কর। কারণ, আল্লাহর মজুরকে কিছুতেই বঞ্চিত করা যায় না'। (মুসনাদে আহমদ)

এভাবে ইসলাম শ্রমিক - মজুরের জন্য ব্যবসার মুনাফায় এবং পণ্যে অংশীদারিত্ব প্রদান করেছে।

উপসংহার:

পরিশেষে এ কথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, আইন, ধর্ম, নীতি, নৈতিকতা, বিবেক-ইত্যাদি সব বিবেচনাতেই একজন শ্রমিক সংশ্লিষ্ট ব্যবসার মুনাফা এবং উৎপাদিত পণ্যের অংশ পাওয়ার হকদার। এ প্রাপ্তির ফলে শ্রমিকের মনোজগতে ব্যবসা ও শিল্পের প্রতি এক প্রকার অলিখিত অনুরাগ ও মমত্ববোধ তৈরি হয়। শ্রমিক নিজের অজান্তেই তার কর্ম, কর্মস্থল ও

কর্মপ্রতিষ্ঠানকে অকৃত্রিমভাবে আপন ভাবতে শুরু করেন। ব্যবসায়িক যে কোন প্রকার সামান্য ক্ষতি তখন তাঁর হৃদয়কে গভীরভাবে বেদনার্ত করে তোলে। প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা ও উন্নয়নে তিনি নিজেকে নিরঙ্কুশ সেবক হিসেবে সোপর্দ করেন। ফলে অনেকটা অবধারিতভাবেই ব্যবসা ও শিল্পে অগ্রগতির চাকা বেগবান না হয়ে পারে না। এভাবে মুনাফার অংকেও উৎকর্ষ সাধন হয়। মালিক যে টাকা শ্রমিককে মুনাফার অংশ হিসেবে দেবেন তার চাইতেও বেশী অর্থ শ্রমিকের অবারিত আন্তরিকতার বদৌলতে অর্জিত হতে শুরু করে। তার চেয়েও বড় কথা হলো, মুনাফার অংশ লাভের মাধ্যমে মালিক-শ্রমিক মিলে পেশাদারিত্বের এক অনুপম পরিবেশ তৈরি হয়। এ পরিবেশ থেকে জন্ম নেয় এমন এক সহজাত পরিবার, যেখানে মালিক ও শ্রমিক মিলে-মিশে ব্যবসায়িক পরিমন্ডলসহ সমাজে সার্বিক ও সর্বোতভাবে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় শান্তি ও সংহতির ভিত রচনায় ব্রতী হন, যা সভ্যতার বুনিয়াদ গঠনের প্রধান অনুষঙ্গ। ■

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক নিয়ন্ত্রণ আইন

মীযানুল করীম

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক পার্টি ও বিরোধী দল রিপাবলিকান পার্টি মিলে ঐতিহাসিক বন্দুক নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করেছে। ফলে কিশোর ও তরুণদের বেপরোয়া বন্দুক ব্যবহার অনেকটা হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আসলে আমেরিকার প্রচলিত আইনে স্ববিরোধিতা রয়েছে। কারণ একদিকে আত্মরক্ষার অধিকার অন্যদিকে বন্ধুক ব্যবহারের উপর নানারকম বিধি নিষেধ। কিছুদিন আগে মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চ পরিষদ সিনেট কঠোর বন্দুক আইন প্রণয়নের পথ সুগম করে দিয়েছিল। তখন সিনেট বিল পাস করেছে ঠিকই তবে সংশ্লিষ্ট প্যাকেজে ডেমোক্রেটদের প্রার্থিত কঠোর বিধি নিষেধ অনেকটাই এগিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অবশ্য যেসব ব্যক্তিকে বিপদজনক মনে করা হয় তাদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার সহজ হয়েছে। এর ফলে স্কুলের নিরাপত্তা, মানসিক স্বাস্থ্য ও সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য স্থানীয়ভাবে তহবিল সংগ্রহ করা সহজ হবে। তবে কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনে চলতি বছর বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের অনেক আশাই পূরণ হয়নি। তারা বছরের পর বছর ধরে এজন্য চেষ্টা করে এসেছিলেন। যেমন অ্যাসল্ট টাইপ অস্ত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং হাই ক্যাপাসিটি অ্যামুনিশন ম্যাগজিন ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা। এগুলো বাফেলো, নিউইয়র্ক এবং ট্যাক্সাসে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছে। এরপরেও মার্কিন সংসদে উভয় দল এ প্রশ্নে নিজ নিজ বিজয় ঘোষণা করেছেন। তারা দেখাতে চান যে, আপোষ করা কিভাবে সম্ভব তা তারা জানেন এবং সরকার কিভাবে চালাতে হয় তাও তারা জানেন। অবশ্য নিজেদের গোড়া সমর্থকদের তারা অসন্তুষ্ট করেন না।

সিনেট নেতা চাক শ্যুমার (ডেমোক্রেট) বলেন, অনেকদিন থেকেই সঠিক পথে এই পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছিল। বন্দুক সহিংসতা আমাদের জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই আইনে অবশ্য সবকিছুর প্রতিকার নেই তবুও বিলটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে বহু জীবন রক্ষা পাচ্ছে। সিনেটার মাইনোরিটি লিডার, রিপাবলিকান দলের মিচ ম্যাক কনেল অস্ত্র বহন করার উপরে আইনের এই দ্বিতীয় সংশোধনীকে সমর্থন করেছেন। ফলে দলের অনেক রক্ষণশীল ভোটার একে সমর্থন করবেন। তিনি বলেন, মার্কিন জনগণ তাদের সাংবিধানিক অধিকারকে সংরক্ষিত করতে চান এবং তাদের শিশুদেরকে স্কুলে নিরাপদ দেখতে চান। তারা এখনি এই দুই বিষয়ে নিশ্চয়তা চাচ্ছেন। এই আইন তার গ্যারান্টি দেবে বলে আশা করা যায়।

যারা আমেরিকায় বন্দুকের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালায়, তাদের সব আশা পূরণ হয়নি। আবার তারা অসন্তুষ্টও নন। অপরদিকে রক্ষণশীলদের মনোভাব বুঝতে পেরে মার্কিন সুপ্রিম

কোর্ট প্রকাশ্যে অস্ত্র বহনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। বৃহত্তম নিউইয়র্ক নগরীতে ও রাজ্যে বিনা দরকারে বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হয় না। সুপ্রিম কোর্ট তাও খারিজ করে দিয়েছে। যাহোক ,মার্কিন সিনেটাররা ৬৫-৩৪ ভোটে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিলটি সমর্থন করেছেন। তারা এই আইনকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করতে চাচ্ছেন। ভোটাভুটিতে ৫০ জন ডেমোক্রেটের সাথে ১৫ জন রিপাবলিকানও আছেন। তাছাড়া দুজন স্বতন্ত্র সদস্য বিলটির সমর্থক।

রিপাবলিকান পার্টি বন্দুক ব্যবহারের ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে উদার। এ দলের সমর্থকদের অনেকেই বন্দুক ব্যবহার করতে চান। তদুপরি ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের গ্রুপগুলো আগ্নেয়াস্ত্রের পক্ষে। উল্লেখ করা যায়, যারা বিরোধিতা করেছেন তাদের মধ্যেও আরকানশাসের টম কটন, টেক্সাসের টেড ক্রুজ, মিসৌরির জোশ হওলি ও সাউথ কেরোলিনার টিম স্কট ২০২৪ সালের নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। তাদের সাথে আছেন কড়া রক্ষণশীল, কেন্টাকির র‍্যান্ড পল এবং ইউটার মাইক লি। অবশ্য এই আইনকে কার্যকর করার জন্য মার্কিন কংগ্রেসকে সব সময় আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এর সম্ভাবনা এখনো ক্ষীণ।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বন্দুক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি কংগ্রেসকে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে তার কাছে বিলটি পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সম্প্রতি আমেরিকার শিকাগোতে দেশটির স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বন্দুকধারী এক ব্যক্তি হামলা চালিয়ে কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করে। তদুপরি ফিলাডেলফিয়াতে বন্দুক নিয়ে মারাত্মক হামলা করা হয়। শিকাগোর ঘটনায় হামলাবাজ ব্যক্তি নারীর ছদ্মবেশ নিয়ে পালাতে চেয়েছিল, কিন্তু ধরা পড়ে যায়। এই সর্বশেষ ঘটনার আগেই সিনেট সংশ্লিষ্ট আইন পাস করেছিল। সিনেটের উক্ত তৎপরতার মাত্র একমাস আগে একজন বন্দুকধারী টেক্সাসের ওভালডে ১৯ জন ছাত্র ২ জন শিক্ষককে হত্যা করে। এই হত্যাকারী ছিল শ্বেতাঙ্গ। উভালডের ঘটনার কয়েকদিন আগে একজন সেতাঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়: সে বর্ণবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে দশজন কৃষ্ণাঙ্গকে হত্যা করেছে বাফেলোতে। উভয় ঘটনায় হত্যাকারী ছিল ১৮ বছর বয়স্ক। এই দুটি ঘটনার মধ্যে অনেক মিল রয়েছে, যা দুই দলের আইন সভার সদস্যরা ও স্বীকার করেছেন। সিনেটে এ আলোচনায় নেতৃত্ব দেন ডেমোক্রেট ক্রিস মারফি ও ক্রিস্টেন সাইনেমা এবং রিপাবলিকান জন করনিন ও থম টিলিস। মারফির এলাকা, কানেকটিকাটের নিউটাউনে ২০১২ সালে একটি স্কুলের ২০ জন ছাত্র ও ৬ জন কর্মচারীকে বন্দুকদারী হত্যা করেছে।

অপরদিকে মিচ মেক কনেলের ঘনিষ্ঠ, করনিনের রাজ্যেও বন্দুক দিয়ে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মারফি বলেন, "আমাদের পদক্ষেপ হাজার মানুষের জীবন বাঁচাবে। এটা প্রমাণ করে বন্দুক হামলায় মার্কিন জনগণ ভীত হলেও গণতন্ত্র সময়ের দাবি পূরণ করতে পারে।" করনিন বলেন, "ওভালডেতে যা ঘটেছে, এরপর আমরা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারিনা।"

এখন থেকে আইন মোতাবেক ১৮-২০ বছর বয়সীদের সবকিছু চেক করেই বন্দুক কেনার সুযোগ দেওয়া হবে। এখন এই কাজে ৩ দিন লাগলেও এই সময় বাড়িয়ে ১০ দিন করা হয়েছে। ফেডারেল ও লোকাল কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্টদের সব রেকর্ড পত্র খতিয়ে দেখবেন।

ঘরোয়া দুর্ব্যবহারের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে পারবেন না। যুক্তরাষ্ট্রে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার অন্যান্য দেশের চাইতে বহুগুণ বেশি। জানা গেছে পৃথিবীতে ৩৯ কোটি বন্দুক চালু ছিল ২০১৮ সালে। প্রতি ১০০ জনে আমেরিকায় ১২০.৫ জন, ইয়েমেনে ৫২.৮, সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোতে ৩৯.১, উরুগুয়ে ও কানাডাতে ৩৪.৭, ইংল্যান্ডে ৩২.৪, লেবাননে ৩১.৯ ও আইসল্যান্ডে ৩১.৭ জনের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। জাপানের জনপ্রিয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী সিং জে আবে বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে ২০১২ সালে প্রতি একশ জনে ৮৮ জনের কাছে বন্দুক ছিল এখন তা ১২০ এরও বেশি। যুক্তরাষ্ট্রে ২০২০ সালে বন্দুকের গুলিতে ৪৫,২২ জন নিহত হয়েছে। এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়। সে দেশের ঘনিষ্ঠ মিত্র ব্রিটেন বা যুক্তরাজ্যের চেয়ে আমেরিকায় প্রায় ২০ গুণ বেশি মানুষ বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়। পাশের দেশ কানাডাতে এর অর্ধেক বন্দুকের গুলিতে মারা যায় না। আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন গড়ে ৫৩ জন লোক মারা যাচ্ছে। ■

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ ঃ আমি হাদীসের মাধ্যমে জানতে পারলাম সন্তানের আকীকা করা সুন্নাত। অর্থাৎ না করলে অসুবিধা নেই। কিন্তু কোন কোন বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যে সন্তানের মাতা-পিতা সন্তানের আকীকা করতে অবহেলা করবে ঐ সন্তান তার মাতা-পিতার জন্য কিয়ামাতের দিন সুপারিশ করবে না। এখন আমার প্রশ্ন হলো- এ কথা কি ঠিক? ঠিক না হলে সঠিক মত জানতে চাই।

মুহাম্মাদ মিনহাজুল ইসলাম
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

উত্তর ঃ আকীকা করা সুন্নাত। তবে 'আকীকা না করলে কোন অসুবিধা নেই' এ কথাটি পুরোপুরি ঠিক নয়। কারণ আকীকা না করলে অন্তত সুন্নাত পালন করা হলো না। আর সুন্নাত পালন না করাটাই তো একটা অসুবিধা। কোন কোন বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে আপনি যা লিখেছেন তা হাদীস নয় বরং তা ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) কর্তৃক একটি হাদীসের অংশবিশেষের ব্যাখ্যা।

হাদীসটি হলো, প্রত্যেকটি সন্তান আকীকার বিনিময়ে বন্ধক রয়েছে। জন্মের সপ্তম দিনে তার আকীকার পশু জবাই করা হবে, তার নাম রাখা হবে এবং মাথা মুণ্ডন করা হবে। –সুনান আবী দাউদ।

'প্রত্যেকটি শিশু সন্তান আকীকার বিনিময়ে বন্ধক রয়েছে' হাদীসটির এ অংশের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) বলেন, যে সন্তান শিশুকালে আকীকা না করা অবস্থায় মারা যায় সে তার পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে না। –নাইলুল আওতার, ৫ম খ, পৃ-২২৫।

হাদীসের এ অংশের ব্যাখ্যায় কেউ বলেছেন, আকীকা করা জরুরী। অপর কেউ বলেছেন, আকীকার পশু জবাই করার পরই শিশুর নাম রাখতে হবে ও তার মাথার চুল মুণ্ডন করতে হবে (প্রাগুক্ত)। মুহাদ্দিসগণের এসব ব্যাখ্যা থেকে নবজাতকের আকীকার গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। উপরোক্ত হাদীস মুতাবিক শিশুর আকীকা তার জন্মের সপ্তম দিনে করতে হবে। পূর্ব পরিকল্পনা না থাকলে কোন কাজই সময় মত করা হয় না। আকীকা করতে অর্থেরও প্রয়োজন রয়েছে। তাই শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব থেকেই তার আকীকা করার জন্য তার পিতা-মাতার পূর্ব পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। তাহলে আশা করা যায় সব পিতা-মাতাই সময়মত অর্থাৎ শিশুর জন্মের সপ্তম দিনেই নিজেদের সন্তানের আকীকা করতে পারবেন। এ দিনে আকীকা করা, শিশুর নাম রাখা ও শিশুর মাথা মুণ্ডন করে চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সাদকা করে দেয়া সুন্নাত।

আকীকা ছেলের জন্য দু'টি ছাগল (খাশি/পাঠি যা-ই হোক)। কারো দু'টি ছাগল আকীকা করার সামর্থ না থাকলে তার পক্ষে একটি ছাগল দ্বারা আকীকা করলেও চলবে। আর মেয়ে সন্তানের আকীকার জন্য একটি ছাগল। আকীকার ছাগল বয়সে কুরবানীর উপযোগী হতে হবে। ছেলের আকীকার ছাগল এক রকম হবে এবং একই সাথে একটির পর অপরটি জবাই করা উত্তম। শিশু জন্মের সপ্তম দিনে কেউ আকীকা করতে অপারগ হলে চৌদ্দতম দিনে করবে। এদিনও যদি কেউ অপারগ হয় তাহলে একুশতম দিনে করবে। এদিনেও যদি কেউ অপারগ হয় তাহলে পরবর্তী যে কোন সময় করতে চাইলে করতে পারে।

প্রশ্ন-২ ঃ আমি বই পড়ে জানতে পারলাম যে রুকু ও সাজদায় দু'আ কবুল হয়। এখন আমার প্রশ্ন- দু'আ করার নিয়ম কি? তাসবীহ পড়ার পর বাংলায় দু'আ করলে হবে কি না?

মফিজুর রহমান
ঢাকা-১২১৭

উত্তর ঃ সাজদায় দু'আ কবুল হওয়া সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, সাজদায় তোমরা দু'আ করার চেষ্টা করো। কেননা সাজদায় তোমাদের দু'আ কবুল হওয়ার উপযোগী। –সহীহ মুসলিম।
হাদীসে আরো এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সাজদারত অবস্থায় বান্দা তার রবের নিকটবর্তী হয়, অতএব তোমরা সাজদায় বেশি বেশি করে দু'আ করো। –সহীহ মুসলিম।
এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাওয়াবী লিখেছেন, এই হাদীসে সাজদায় দু'আ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। অতএব সাজদায় সাজদার তাসবীহ পাঠ ও দু'আ করা মুস্তাহাব।
ফরয নামাযে ইমাম মুক্তাদীগণের প্রতি লক্ষ্য রেখে কিরায়াত, রুকূ' সাজদা প্রভৃতি হালকা করবে। ফলে ফরয নামাযে সাজদার তাসবীহ পাঠ করার পর দু'আ করার সুযোগ কম। সুন্নাত ও নফল নামাযে তাসবীহ পাঠ করার পর ব্যক্তির পক্ষে দু'আ করার সুযোগ থাকে। নামাযে সরাসরি হাদীস কর্তৃক বর্ণিত দু'আ অথবা আরবী ভাষায় হাদীসের ভাবার্থ দু'আ পাঠ করা যাবে। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর প্রসিদ্ধ বর্ণনা উদ্ধৃত করে ইমাম ইবন তাইমিয়া (র) এ সম্পর্কে লিখেছেন, শরী'আত সম্মত সুন্নাহ কর্তৃক বর্ণিত দু'আ ব্যতিত অন্য কোন দু'আ দ্বারা নামাযে দু'আ করা যাবে না। আসরাম বলেন, আমি ইমাম আহমদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাশাহ্হুদের পর কি দিয়ে দু'আ করবো? জবাবে তিনি বললেন, হাদীসে যেসব দু'আ এসেছে তা দ্বারা। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) কি বলেননি, "অতপর সে তার পছন্দমত যে কোন দু'আ পড়বে।" তিনি বললেন, সেটা হবে হাদীসে বর্ণিত যে কোন দু'আ। তিনি আরো লিখেছেন, নামাযে অনারব ভাষায় দু'আ করা ইমাম আহমদ (র) মাকরূহ মনে করেন। (দেখুন, ফাতওয়া ইমাম ইবন তাইমিয়া, ২২ খ, পৃ. ৪৭৪-৪৮০)
অতএব, নামাযে তাশাহ্হুদের পর বা সাজদায় সেসব দু'আ করাই শ্রেয় যা রাসূলুল্লাহ (সা.) করেছেন। নিম্নে সাজদার কয়েকটি দু'আ উল্লেখ করা হলো।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ –

হে আল্লাহ! আপনি আমার পূর্বাপর, ছোট-বড়, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল গুনাহ মাফ করে দিন। –সহীহ মুসলিম।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি হে আল্লাহ! হে আমাদের রব। প্রশংসা আপনারই জন্য। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। –সহীহ মুসলিম।

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা সহকারে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। –সহীহ মুসলিম।

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা সহকারে (বলছি) আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। –সহীহ মুসলিম।

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَأُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلى نَفْسِكَ

হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার অসন্তোষ থেকে আশ্রয় চাই। আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার আশ্রয় চাই। আমি আপনার কাছেই আশ্রয় চাই। আপনার প্রশংসা ও গুণগান করার শক্তি আমার নেই। আপনি নিজে আপনার যে প্রশংসা করেছেন আপনি ঠিক তদ্রূপ। –সহীহ মুসলিম।

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ

মহামহিম মহাপবিত্র আল্লাহ ফেরেশতামণ্ডলী ও জিবরাঈলের রব।

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

হে আল্লাহ! আপনার উদ্দেশ্যেই আমি সাজদা করলাম। আপনার প্রতি আমি ঈমান এনেছি। আপনার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করছি। আমার মুখমণ্ডল সেই মহান সত্তার উদ্দেশ্যে সাজদা করলো যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং (সর্বোত্তম) আকৃতি দান করেছেন। কান ও চোখ ফেড়ে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। মহা কল্যাণময় আল্লাহ, তিনি কতইনা উত্তম সৃষ্টিকারী। –সহীহ মুসলিম।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِىْ نُوْرًا وَاَمَامِىْ نُوْرًا وَخَلْفِىْ نُوْرًا وَفَوْقِىْ نُوْرًا وَتَحْتِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا اَوْ قَالَ وَاجْعَلْنِىْ نُوْرًا

হে আল্লাহ! আপনি আমার হৃদয়-মনে আলো দান করুন, আমার শ্রবণশক্তিতে আলো দান করুন, আমার দৃষ্টিশক্তিতে আলো দান করুন, আমার ডানদিকে আলো দান করুন, আমার বামদিকে আলো দান করুন, আমার উপরদিকে আলো দান করুন, আমার নিচের দিকে আলো দান করুন এবং আমার জন্য আলো সৃষ্টি করুন। অথবা তিনি বললেন, আমাকে আলো বানিয়ে দিন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) সাজদায় উপরোক্ত সব দু'আ একত্রে পাঠ করতেন না। কখনো একটি আবার কখনো অন্যটি। সাজদার তাসবীহ পাঠ করার পর এসব দু'আ পাঠ করা এবং এসব দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দু'আ করা মুস্তাহাব। সাজদায় একাধিক দু'আও পাঠ করা যায়।

নামাযে তাশাহ্হুদের পর এবং রুকূ' ও সাজদায় যেসব দু'আ পাঠ করার কথা হাদীসে উল্লেখ আছে, সেসব দু'আ যথাস্থানে পাঠ করা সুন্নাত। এ ছাড়াও ইচ্ছা করলে হাদীসে আরো যেসব সুন্দর ও মর্মস্পর্শী দু'আ আছে তা-ও পড়া যাবে। এমনকি এসব দু'আর ভাব সম্বলিত দু'আ (আরবী ভাষায়) পাঠ করার অনুমতিও রয়েছে। তবে অনারবী ভাষায় নামাযের রুকূ' সাজদা ও তাশাহ্হুদের পর দু'আ করার পক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ■

ফতোয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা